হিন্দুধর্ম শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

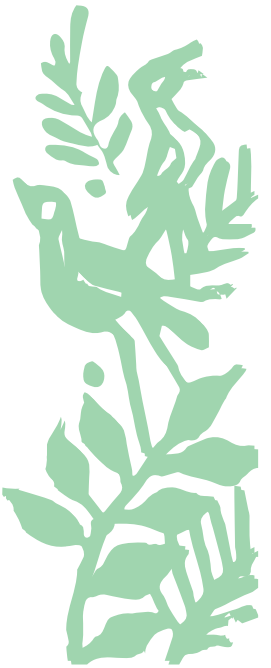

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০২৫

রচনা, সংকলন ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. অসীম সরকার

অধ্যাপক ড. ময়না তালুকদার

অর্চনা সাহা

তাপসী রানী দাস

স্বপ্না রানী সিংহ

মোঃ মনির হোসেন মজুমদার

শিল্প নির্দেশনায়

হাশেম খান

ছবি, অলংকরণ ও গ্রাফিক ডিজাইন

সজীব সেন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা এবং বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার উপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান অনুসরণ করা হয়েছে ও উন্নত বিশ্বের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অংশীজনদের চাহিদা এবং মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ ২০২৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহ ইতোমধ্যে পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে । শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশে সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

চতুর্থ শ্রেণির 'হিন্দুধর্ম শিক্ষা' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের সময়ে পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণিতে সাধারণত নয় বছরের অধিক বয়সের শিশুরা পাঠ গ্রহণ করে। বয়সের কথা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তকে শিখন বিষয়ের উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে যেন সক্ষম হয়, সে চেষ্টা করা হয়েছে। চারটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকেই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্তকরণ এবং সমন্বয় কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞগণ, চিত্রশিল্পী এবং ইনডিজাইনারসহ যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্তকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	**স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং উপাসনা ও প্রার্থনা**	
প্রথম পরিচ্ছেদ	স্রষ্টা ও সৃষ্টি	১-৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	উপাসনা ও প্রার্থনা	৬-১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	**আদর্শ জীবনচরিত**	
প্রথম পরিচ্ছেদ	মুনি-ঋষি	১৪-২১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী	২২-২৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	জীবনাদর্শ অনুসরণ	৩০-৩৩
তৃতীয় অধ্যায়	**নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি**	
প্রথম পরিচ্ছেদ	ত্যাগ	৩৪-৪০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	উদারতা	৪১-৪৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	পরমতসহিষ্ণুতা	৪৭-৫১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর প্রতি ভালোবাসা	৫২-৫৫
চতুর্থ অধ্যায়	**ধর্মগ্রন্থ, দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ, যোগব্যায়াম, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র**	
প্রথম পরিচ্ছেদ	হিন্দুধর্মগ্রন্থ	৫৬-৬১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ	৬২-৬৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	যোগব্যায়াম ও আসন	৭০-৭৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র	৭৬-৮২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান	৮৩-৮৬
পঞ্চম অধ্যায়	**জীবসেবা ও দেশপ্রেম**	
প্রথম পরিচ্ছেদ	মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগৎ	৮৭-৯২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	জীবসেবা	৯৩-৯৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	দেশপ্রেম	৯৯-১০৩

প্রথম অধ্যায়

স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং উপাসনা ও প্রার্থনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

আমাদের পৃথিবী কত সুন্দর! যেদিকে তাকাই সেদিকেই সৌন্দর্যের হাতছানি। নানা বৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ আমাদের চারপাশ। চলো, আমরা সবাই মিলে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে আসি।

ছবিতে যা দেখা যাচ্ছে লেখ:

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

অপরূপ সুন্দর আমাদের এই পৃথিবী। পৃথিবীতে রয়েছে মানুষ, গাছপালা, ফুল-ফল, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, আকাশ-বাতাস, মরু-প্রান্তর ইত্যাদি।

পৃথিবীর কোনো কিছুই হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আজকের এই সুন্দর পৃথিবী। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, এসব কে সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চয়ই এর পিছনে একজন স্রষ্টা আছেন। যেমন কাঠমিস্ত্রি তৈরি করেন চেয়ার-টেবিল, রাজমিস্ত্রি তৈরি করেন দালান-কোঠা। তেমনি চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, মানুষ, অন্যান্য জীব এবং জগতের সবকিছুর একজন স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা আছেন। যিনি সকল শক্তির উৎস, সর্বশক্তিমান। অসীম তাঁর ক্ষমতা। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি পরম পিতা, পরম স্রষ্টা, পরমেশ্বর, ভগবান। তিনি দয়াময়, কৃপাময়, করুণাময়। তিনিই ঈশ্বর। তিনি নিরাকার। তাঁকে দেখা না গেলেও তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে অনুভব করি। সাধকেরা সাধনার মাধ্যমে এবং ভক্তরা ভক্তির মাধ্যমে তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করেন।

আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীর সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। কেবল পৃথিবীই নয়, এর বাইরেও যা কিছু আছে তার স্রষ্টাও ঈশ্বর। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক । এ সম্পর্ক হচ্ছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক। ঈশ্বর স্রষ্টা, জীব তাঁর সৃষ্টি। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। লালন-পালন করেন। তিনি আমাদের মঙ্গল করেন। এজন্য আমরা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাই আমরা ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করব, ভক্তি করব, বিশ্বাস করব, ভালোবাসব। তাঁর প্রতি আস্থাশীল হব।

ঈশ্বর জীবদেহে আত্মারূপে অবস্থান করেন। এ কারণে সকল জীবকে আমরা ঈশ্বরের অংশ মনে করব। সকল জীবকে ভালোবাসব। ভালোবাসব ঈশ্বরের সৃষ্টিকে। শ্রদ্ধাশীল হব তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি । জীবকে ভালোবাসাই ঈশ্বরকে ভালোবাসা। জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন:

“বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।।”

ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালোবাসলে তিনি সন্তুষ্ট হন। তিনি আমাদের কৃপা করেন। তাই ঈশ্বর ও তাঁর সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা আমাদের কর্তব্য। এ নৈতিক শিক্ষাটি আমরা সব সময় মনে রাখব এবং দৈনন্দিন জীবনে তা অনুশীলন করব।

কেন ঈশ্বরকে ভালোবাসব? এ সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ:

১

২

৩

নিচের ছকটি পূরণ করো:

স্রষ্টার বিভিন্ন নাম

অনুশীলনী

ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. অপরূপ ---------- আমাদের এই পৃথিবী।
২. সব কিছুর একজন --------- আছেন।
৩ ঈশ্বর জীবের মধ্যে ---------- অবস্থান করেন।
৪. ঈশ্বর ও তাঁর সকল সৃষ্টিকে ---------- আমাদের কর্তব্য।
৫. ঈশ্বর সর্বত্র ---------- ।

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. ঈশ্বর আমাদের	সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।
২. ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালোবাসলে	শ্রদ্ধা করব, ভক্তি করব ও ভালোবাসব।
৩. জীবে প্রেম করে যেই জন	ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।
৪. আমরা ঈশ্বরকে	সৃষ্টি করেছেন।
৫. ঈশ্বর জীবের	বহুরূপে সম্মুখে তোমার।
	অন্তরে অবস্থান করেন।

গ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. আজকের এই সুন্দর পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

ক) হঠাৎ করে
খ) দীর্ঘ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে
গ) স্বল্প পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে
ঘ) নিজে নিজে

২. কাঠমিস্ত্রি কী তৈরি করেন?

ক) চেয়ার-টেবিল　　খ) দালান-কোঠা

গ) জামা-কাপড়　　ঘ) বই-খাতা

৩. ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে সম্পর্ক –

ক) নিবিড়　　খ) গভীর

গ) হালকা　　গ) ঘনিষ্ঠ

৪. 'বহরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর'? – উক্তিটি কার?

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর　　খ) স্বামী বিবেকানন্দ

গ) ঋষি অরবিন্দ　　ঘ) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. এই পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?

২. অপরূপ সুন্দর আমাদের এই পৃথিবীতে কী কী রয়েছে?

৩. সৃষ্টিকর্তার কয়েকটি নাম লেখ।

৪. আমরা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ কেন?

৫. ঈশ্বর জীবের মধ্যে কীরূপে অবস্থান করেন?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. ঈশ্বরের গুণাবলি বর্ণনা করো।

২. "পৃথিবীর সবকিছুর নিয়ন্ত্রক ঈশ্বর"– ব্যাখ্যা করো।

৩. ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।

৪. তোমাদের পাঠ্যাংশে উদ্ধৃত স্বামী বিবেকানন্দের বাণীটি লেখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপাসনা ও প্রার্থনা

ছবিটিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ লেখ:

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

উপাসনা

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি সর্বত্র অবস্থান করেন। কীভাবে আমরা তাঁকে জানব? কীভাবে তাঁকে উপলব্ধি করব? ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য তাঁর উপাসনা করতে হয়। প্রার্থনা করতে হয়। উপাসনা ও প্রার্থনা ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি, শ্রদ্ধা করতে পারি। ভালোবাসতে পারি তাঁর সৃষ্টিকে।

উপাসনা শব্দের অর্থ নিকটে বসা। 'উপ' অর্থ নিকটে এবং 'আসন' অর্থ বসা। প্রশ্ন হতে পারে কার নিকটে বসা? ঈশ্বরের নিকটে বসা। সুতরাং ঈশ্বরের নিকটে বসাই হলো উপাসনা। অর্থাৎ যে কাজের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে কাছে পেতে পারি, তাই উপাসনা। উপাসনায় একাগ্রচিত্তে ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের আরাধনা করা হয়। ঈশ্বরকে স্মরণ করা হয়। একমনে তাঁকে ডাকা হয়। তাঁর গুণকীর্তন, পূজা-অর্চনা, স্তব-স্তুতি, ধ্যান-জপ ইত্যাদি করা হচ্ছে উপাসনা।

উপাসনার সময় ঈশ্বরের প্রশংসা করা হয়। তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়। সকলের কল্যাণ কামনা করা হয়।

সাকার ও নিরাকার দুই ভাবেই ঈশ্বরের উপাসনা করা যায়। 'সাকার' অর্থ যার আকার বা রূপ আছে। অতএব সাকার উপাসনা হচ্ছে নিরাকার ঈশ্বরের সাকার রূপের আরাধনা করা। জগতের কল্যাণের জন্য নিরাকার ঈশ্বর সাকার রূপ ধারণ করেন। বিভিন্ন দেব-দেবী যেমন: শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক প্রভৃতি ঈশ্বরের সাকার রূপ। সাকার উপাসনায় দেব-দেবীর প্রতিমা বা প্রতীকের সামনে বসে পূজা-অর্চনা করতে হয়। যজ্ঞ করতে হয়।

ব্রহ্মই ঈশ্বর। ঈশ্বর নিরাকার। নিরাকার মানে যার কোনো আকার বা রূপ নেই। ব্রহ্মের কোনো রূপ নেই। ঈশ্বরের কোনো প্রতীক বা রূপ ছাড়া ধ্যান, জপ, গুণকীর্তনের মাধ্যমে উপাসনা হচ্ছে নিরাকার উপাসনা।

উপাসনা একটি নিত্যকর্ম। প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় উপাসনা করতে হয়। তবে সব সময়ই উপাসনা করা যেতে পারে। উপাসনার আগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ করে সোজা হয়ে উপাসনায় বসতে হয়। বিশেষ আসনে উপাসনায় বসতে হয়। যেমন: পদ্মাসন, সুখাসন। একা বসে উপাসনা করা যায়। আবার অনেকে একসাথে বসেও উপাসনা করা যায়। অনেকে একত্র হয়ে উপাসনা করাকে সমবেত উপাসনা বলা হয়। উপাসনায় দেহ-মন পবিত্র হয়। উপাসনা আমাদের সৎপথে তথা ধর্মপথে পরিচালিত করে।

উপাসনা কীভাবে করতে হয় লেখ:

প্রার্থনা

উপাসনার একটি দিক হচ্ছে প্রার্থনা। প্রার্থনা শব্দের অর্থ চাওয়া, কামনা করা। আমরা কেউ পরিপূর্ণ নই। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু চাওয়া-পাওয়া থাকে। বড়োদের কাছেও চাই আবার ছোটোদের কাছেও চাই। তবে কেবল অভাবের জন্যই আমরা চাই না। ভালো থাকার জন্য চাই। ভালো কাজ করার জন্য চাই। নিজের এবং অন্যের মঙ্গলের জন্যও চাই। এরূপ চাওয়াই হচ্ছে প্রার্থনা।

আমাদের ধর্মগ্রন্থে বহু প্রার্থনা মন্ত্র রয়েছে। নিচের প্রার্থনা মন্ত্রটি পাঠ করি:

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।
(বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১/৩/২৮)

সরলার্থ: আমাকে অসৎ থেকে সতে নিয়ে যাও। অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও। মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও।

ঈশ্বর মহান। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি দয়াময়, করুণাময়, মঙ্গলময়। তিনি সকলের কামনা-বাসনা পূরণ করেন। এ কারণে আমরা ঈশ্বরের কাছেই সবকিছু চাই। ঈশ্বরের কাছে ভক্তিসহকারে কিছু চাওয়াই হচ্ছে প্রার্থনা।

প্রার্থনা করার আগে নিজেকে শুচি করতে হয়। পবিত্র হতে হয়। প্রার্থনায় ধীর-স্থির হয়ে বসতে হয়। মনে বিনয়ী ভাব থাকতে হয়। হাত জোড় করে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়। ঈশ্বরের গুণকীর্তন করতে হয়। নিজের ভালো চাইতে হয়। অন্যেরও ভালো চাইতে হয়। সকল জীবের কল্যাণ কামনা করতে হয়। ঈশ্বর যেন তাঁর সকল সৃষ্টিকে ভালো রাখেন, সবাইকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন–এজন্য প্রার্থনা করতে হয়। ভালো মানুষ হওয়ার জন্য, সৎপথে চলার জন্য প্রার্থনা করতে হয়।

যেকোনো অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা যায়। প্রার্থনা নীরবে করা যায়। সরবে করা যায়। একা করা যায়। সমবেতভাবে করা যায়। সমবেত প্রার্থনায় সবাই একত্রিত হয়। এতে সবার মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ব্যক্তি ও সমাজজীবনে উপাসনা ও প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম। উপাসনা ও প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা সৎ ও ধার্মিক হতে পারি। ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি। নিয়মিত উপাসনা ও প্রার্থনা করলে কাজের প্রতি আমাদের মনোযোগ বাড়ে। দেহ-মন ভালো থাকে। শরীর সুস্থ থাকে। তাই আমরা নিয়মিত উপাসনা ও প্রার্থনা করব।

দেবী দুর্গার একটি প্রণাম মন্ত্র এখানে উল্লেখ করা হলো:

শরণাগতদীনার্ত পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে।।
(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১/১১)

সরলার্থ: হে দেবী, শরণাগত, দরিদ্র ও পীড়িতজনের পরিত্রাণকারিণী, সকলের দুঃখবিনাশিনী, হে নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।

দলে আলোচনা করে উপাসনা ও প্রার্থনার উপকারিতা লেখ:

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

এসো আমরা ভক্তিসহকারে প্রার্থনা সংগীতটি অনুশীলন করি:

অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে–
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো,
সুন্দর করো হে।।
জাগ্রত করো, উদ্যত করো,
নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।।
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত করো হে বন্ধ।
সঞ্চার করো সকল কর্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।।
চরণপদ্মে মম চিত নিস্পন্দিত করো হে।
নন্দিত করো, নন্দিত করো,
নন্দিত করো হে।।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাঞ্জলি)

অনুশীলনী

ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১) উপাসনা শব্দের অর্থ ---------- বসা।

২) ---------- অর্থ যার আকার বা রূপ আছে।

৩) ব্রহ্মের কোনো ---------- নেই।

৪) উপাসনা একটি ---------- ।

৫) আমাকে ---------- থেকে সতে নিয়ে যাও।

৬) ---------- প্রার্থনায় সবাই একত্রিত হয়।

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. ঈশ্বর	প্রার্থনা।
২. উপাসনা একটি	দেহ-মন ভালো থাকে।
৩. ঈশ্বরের আরাধনা করাই	নিত্যকর্ম।
৪. উপাসনা ও প্রার্থনায় আমাদের	উপাসনা।
৫. ঈশ্বরের কাছে ভক্তিসহকারে কিছু চাওয়াই হচ্ছে	সর্বশক্তিমান।
	সৎ পথে চলা।

গ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য –

ক) উপাসনা করতে হয় খ) পূজা করতে হয়

গ) ভালোবাসতে হয় ঘ) শ্রদ্ধা করতে হয়

২. উপাসনা ও প্রার্থনা ধর্মের –

ক) অনিবার্য অঙ্গ খ) গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ

গ) প্রয়োজনীয় অঙ্গ ঘ) অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

৩. উপ অর্থ –

ক) সামনে খ) দূরে

গ) নিকটে ঘ) পাশাপাশি

৪. উপাসনা একটি –

ক) নিত্যকর্ম খ) মাসিক কর্ম

গ) ষান্মাসিক কর্ম ঘ) বাৎসরিক কর্ম

৫. উপাসনায় দেহ-মন –

ক) পরিচ্ছন্ন হয় খ) পবিত্র হয়

গ) পরিষ্কার হয় ঘ) ভালো হয়

৬. ব্যক্তি ও সমাজজীবনে উপাসনা ও প্রার্থনার গুরুত্ব –

ক) অনেক খ) অনস্বীকার্য

গ) বর্ণনাতীত ঘ) অপরিসীম

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. উপাসনা কাকে বলে?

২. উপাসনা কত প্রকার ও কী কী?

৩. সাকার উপাসনা কাকে বলে?

৪. নিরাকার উপাসনা কাকে বলে?

৫. কোন কোন আসনে উপাসনায় বসতে হয়?

৬. প্রার্থনা কাকে বলে?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. কীভাবে উপাসনা করতে হয় – ব্যাখ্যা করো।

২. প্রার্থনা কীভাবে করতে হয়?

৩. তোমাদের পাঠ্যাংশ থেকে প্রার্থনা মন্ত্রটি সরলার্থসহ লেখ।

৪. উপাসনা ও প্রার্থনার গুরুত্ব বর্ণনা করো।

৫. তোমাদের পাঠ্যাংশ অবলম্বনে দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্রটি সরলার্থসহ লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুনি-ঋষি

ছবির নিচে নাম লেখ:

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

প্রাচীনকালে অনেক ধার্মিক লোক ছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরের তপস্যা করতেন। তাঁদের কোনো লোভ-লালসা ছিল না। তাঁরা তপস্যার দ্বারা লোভ-লালসা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা জয় করেছিলেন। বিশেষ জ্ঞানলাভ করেছিলেন। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা হলেন মুনি।

কোনো কোনো মুনিকে ঋষি বলা হতো। তপস্যার ফলে যেসব মুনি বেদমন্ত্র প্রকাশ করতে পারতেন, তাঁরাই ঋষি। ঋষিদের মুখ থেকে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল। বেদের কবিতাগুলোকে বলা হয় মন্ত্র। মুনি-ঋষিরা ছিলেন সেকালের গুরু বা শিক্ষক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের উদ্ভাবক। কয়েকজন বিখ্যাত মুনি-ঋষি হলেন– অত্রি, কশ্যপ, গৌতম, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কণ্ব, মৈত্রেয়ী, গার্গী, লোপামুদ্রা প্রমুখ। ঋষিদের সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে– ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, পরমর্ষি, কাণ্ডর্ষি, শ্রুতর্ষি ও রাজর্ষি। মুনি-ঋষিরা ছিলেন অনেক গুণের অধিকারী। তাঁরা মহান। তাঁরা সব সময় সকলের মঙ্গল কামনা করতেন। অপরের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণও ত্যাগ করতে পারতেন। মুনি-ঋষিদের কাছ থেকে আমরা পারমার্থিক জ্ঞানের কথা জানতে পারি। তাঁদের মতো আমরাও জ্ঞানের চর্চা করব। সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করব।

আগের শ্রেণিতে আমরা কয়েকজন মুনি-ঋষির নাম জেনেছি। এখানে আমরা দুজন মুনি-ঋষি সম্পর্কে জানব:

বিদুষী গার্গী

বৈদিকযুগেও বিদ্যাচর্চা হতো। নারী-পুরুষ একত্রে বিদ্যাচর্চা করতেন। তাঁরা আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক করতেন। ব্রহ্মবিদ্যা চর্চা করতেন। স্রষ্টা, সৃষ্টি, আত্মা, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি সম্পর্কিত গভীর জ্ঞানকে বলা হয় ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। ব্রহ্ম থেকেই জীব ও জগতের সৃষ্টি।

বৈদিক সাহিত্যে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল ও তাৎপর্যপূর্ণ। নারীরা ছিলেন শিক্ষিত, স্বাধীনচেতা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও স্বাবলম্বী। বেদে অনেক নারী ঋষির নাম পাওয়া যায়। যেমন– অপালা, গার্গী, ঘোষা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা প্রমুখ। তাঁদের মধ্যে গার্গী ছিলেন অগ্রগণ্য। পিতার কাছেই গার্গী ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা শুরু করেন। কালক্রমে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এজন্য তাঁকে বলা হয় ব্রহ্মবাদিনী বিদুষী গার্গী।

গার্গীর ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে একটি কাহিনি আছে। একবার মিথিলার রাজা জনক যজ্ঞের আয়োজন করেন। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জ্ঞানী-গুণী, সাধু-সন্ন্যাসীরা যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে বহু মুনি-ঋষির আগমন ঘটে। বিদুষী গার্গীও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই যজ্ঞে অনেক দান-দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল।

রাজা জনক যজ্ঞসভায় ঘোষণা করেছিলেন, তিনি এক হাজার গাভী এবং দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করবেন। তবে একটি শর্ত দিলেন, যিনি এই সভায় শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী হবেন, তিনিই এই দান গ্রহণ করতে পারবেন। রাজা জনকের ঘোষণা শুনে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য উঠে দাঁড়ালেন। তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী দাবি করলেন। গাভী ও স্বর্ণমুদ্রা তাঁকে প্রদান করতে বললেন। সবাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিলেন। কিন্তু বিদুষী গার্গী তা বিনাবাক্যে মেনে নিলেন না। তারপর গার্গী ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে বিতর্ক শুরু করলেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলেন। প্রশ্নের বিষয় ক্রমে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, কঠিন থেকে কঠিনতর হতে লাগল। যাজ্ঞবল্ক্যও সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

একপর্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে থামতে বললেন। তিনি বললেন, বেদে প্রশ্ন করার একটা সীমা নির্দেশ করা রয়েছে। এর পরেও গার্গী দুটি প্রশ্ন করলেন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্ন দুটির উত্তরে বললেন, "এই জগৎ সংসারের সবকিছুর অন্তরালে রয়েছে এক আদি অক্ষর পরমব্রহ্ম। তিনি ছায়াহীন, কর্মহীন, চক্ষুহীন, জিহ্বাহীন, মনোহীন, পরিমাণহীন, অন্তহীন, শাশ্বত ও ইন্দ্রিয় জগতের ঊর্ধ্বে।" গার্গী তখন শ্রদ্ধাসহকারে নমস্কার জানিয়ে প্রশ্ন করা থেকে বিরত হলেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসা করলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো। যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনকের দান গ্রহণ করলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী হলেও গার্গীর জ্ঞানও কম ছিল না। যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করা, তাঁর সঙ্গে জ্ঞানের আলোচনা করা ইত্যাদি থেকে গার্গীর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য এবং উপস্থিত সকলে গার্গীকে তাঁর বিচক্ষণতার জন্য ব্রহ্মবাদিনী বলে স্বীকার করে নিলেন। সবাই তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

আজও আমরা বিদুষী গার্গীকে স্মরণ করি। শ্রদ্ধা করি। ইতিহাসে বিদুষী গার্গীর পাণ্ডিত্য অবিস্মরণীয়। ব্রহ্মবাদিনী গার্গী বৈদিক সাহিত্যে একজন মহান দার্শনিক হিসেবে স্বীকৃত ও সম্মানিত।

ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এবং বিদুষী গার্গীর জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, জ্ঞানই পরম সম্পদ। জ্ঞান অর্জনের জন্য ধৈর্য, সাহস, মনোবল, আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধা, সততা, নিষ্ঠার প্রয়োজন। বাহুবলের চেয়ে তপোবল বড়ো, অস্ত্রবলের চেয়ে জ্ঞানবল বড়ো। সকল প্রকার বলের চেয়ে জ্ঞানবল শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানেই মেলে মুক্তি। জ্ঞানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। যথার্থ জ্ঞানে জ্ঞানী হলে পরিবার তথা সমাজে নারী-পুরুষ উভয়ই সমাদর লাভ করেন। অতএব আমরাও যথার্থ জ্ঞান অর্জন করব এবং সকলের মাঝে তা বিলিয়ে দেব।

জ্ঞান অর্জনের জন্য তুমি গার্গীর কোন গুণগুলো অনুসরণ করবে লেখ:

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

বশিষ্ঠ মুনি

বশিষ্ঠ একজন পৌরাণিক মুনি। তিনি মিত্রাবরুণের পুত্র। এ কারণে তাঁর নাম মৈত্রাবরুণি। তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র । সূর্যবংশের কুলগুরু ও কুলপুরোহিত। বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম ছিল তপোবনে। একবার রাজা বিশ্বামিত্র শিকারে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল অনেক সৈন্যসামন্ত। ঘুরতে ঘুরতে সবাই খুব ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন। কাছেই ছিল বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম। বিশ্বামিত্র সবাইকে নিয়ে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে গেলেন। নন্দিনী নামে বশিষ্ঠের একটি কামধেনু ছিল। তার কাছে যা চাওয়া হতো, তা-ই পাওয়া যেত। বশিষ্ঠ মুনি নন্দিনীর কাছে অতিথিদের জন্য খাবার ও পানীয় চাইলেন। নন্দিনী বশিষ্ঠ মুনিকে খাবার ও পানীয় দিল। তিনি তা দিয়ে বিশ্বামিত্র ও তাঁর সৈন্যদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটালেন। সকলের ক্লান্তি দূর হলো।

বিশ্বামিত্র কামধেনুর ক্ষমতা দেখে খুব অবাক হলেন। মনে মনে তিনি কামধেনুটি কামনা করলেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বিনিময়ে তাঁকে এক হাজার গাভী দেওয়ার কথা বললেন। কিন্তু বশিষ্ঠ মুনি সম্মত হলেন না। যখন বিশ্বামিত্র জোর করে

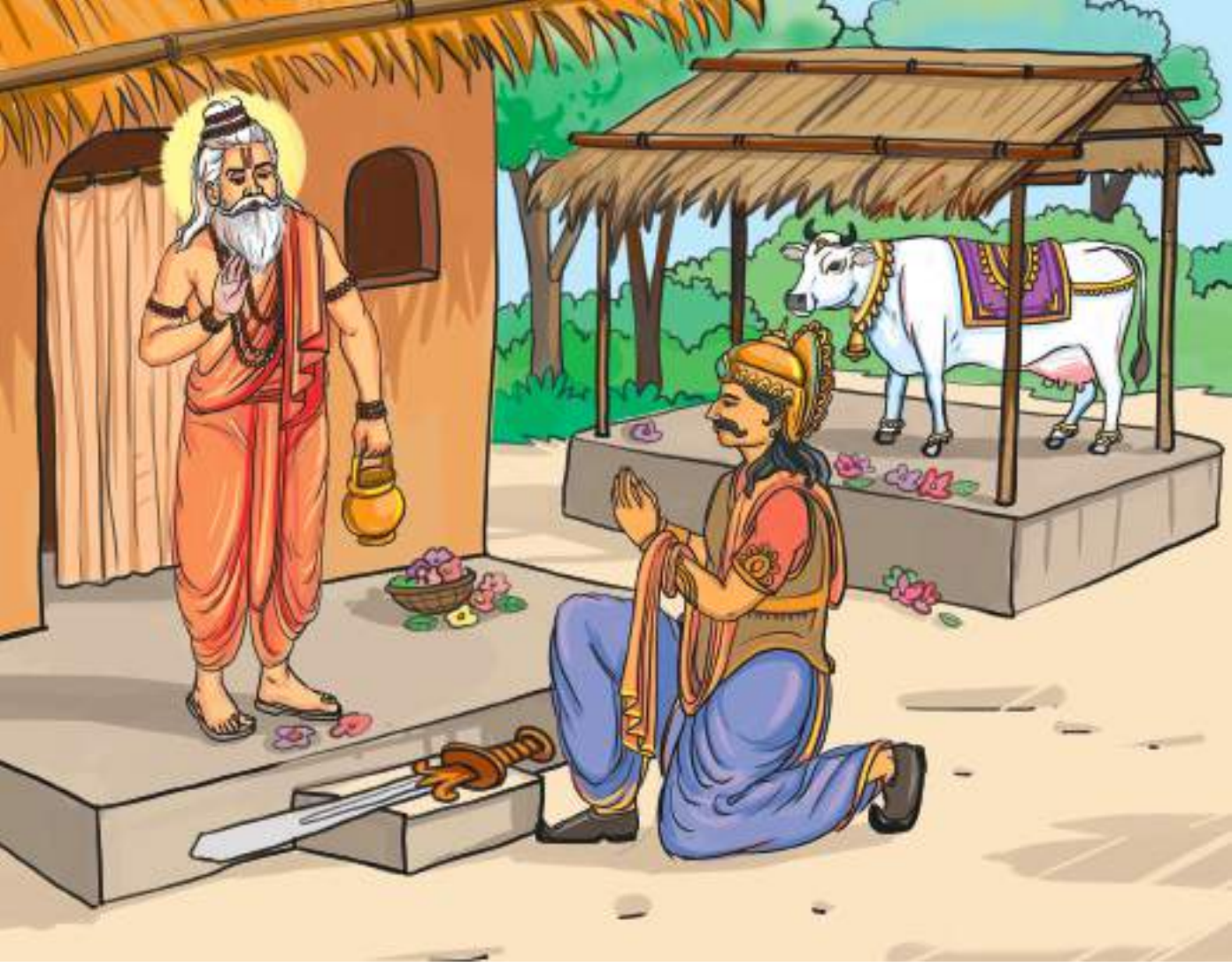

কামধেনুটি নিতে গেলেন, তখন কামধেনু ভয়ংকর রূপ ধারণ করল। তার বিভিন্ন অঙ্গ থেকে অনেক সৈন্যের সৃষ্টি হলো। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হলো। বিশ্বামিত্রের সৈন্যরা যুদ্ধে হেরে গেল। এবার বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে আক্রমণ করলেন। একটার পর একটা বাণ নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু বশিষ্ঠের কিছুই হলো না। বশিষ্ঠ ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে বিশ্বামিত্রের বাণ নষ্ট করে দিলেন। বিশ্বামিত্র পরাজিত হলেন। তিনি বশিষ্ঠের কাছে ক্ষমা চাইলেন। বশিষ্ঠ তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। তিনি বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে ফিরে গিয়ে ভালোভাবে রাজ্য শাসন করতে বললেন। বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মর্ষি হওয়ার আশীর্বাদ করলেন। বশিষ্ঠ আরও বললেন, তপস্যাই শ্রেষ্ঠ শক্তি। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ মুনির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে রাজ্যে ফিরে গেলেন।

আমরাও বশিষ্ঠ মুনির মতো ক্ষমাশীল হব, হিংসা বর্জন করব। মানুষের কল্যাণের জন্য ভাবব। মানুষের মঙ্গল কামনা করব। তাঁর জীবন থেকে ত্যাগ, অহিংসা ও সহনশীলতার শিক্ষা গ্রহণ করব।

তোমার পাশের সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে বশিষ্ঠ মুনির চারটি গুণের কথা লেখ:

১	
২	
৩	
৪	

অনুশীলনী

ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো

১. বেদের কবিতাগুলোকে বলা হয় ----------।
২. মুনি-ঋষিরা ছিলেন অনেক ---------- অধিকারী।
৩. সকল প্রকার বলের চেয়ে ---------- শ্রেষ্ঠ।
৪. বশিষ্ঠ একজন ----------মুনি।

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. গার্গীকে বলা হতো	সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা।
২. ব্রহ্মবিদ্যা	পৌরাণিক মুনি।
৩. জ্ঞানই শক্তি,	ব্রহ্মবাদিনী বিদূষী।
৪. বশিষ্ঠ একজন	জ্ঞানেই মেলে মুক্তি।
৫. কামধেনু নন্দিনী বশিষ্ঠ মুনিকে	নারী ঋষি।
	খাবার ও পানীয় দিল।

গ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. ঋষিদের কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে?

ক) ৫টি　　খ) ৪টি

গ) ৩টি　　ঘ) ৭টি

২. বৈদিক সাহিত্যে নারীদের ভূমিকা ছিল –

ক) মহিমান্বিত ও প্রশংসনীয়　　খ) স্মরণীয় ও বরণীয়

গ) গৌরবোজ্জ্বল ও তাৎপর্যপূর্ণ　　ঘ) উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ

৩. মিথিলার রাজা জনক আয়োজন করেছিলেন –

ক) জনসভা　　খ) বিতর্কসভা

গ) যজ্ঞসভা　　ঘ) ধর্মসভা

৪. রাজা যজ্ঞে কী দান করার ঘোষণা দিয়েছিলেন?

ক) ২ হাজার গাভী ১২ হাজার স্বর্ণমুদ্রা　　খ) ৩ হাজার গাভী ১১ হাজার স্বর্ণমুদ্রা

গ) ১ হাজার গাভী ১০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা　　ঘ) ৪ হাজার গাভী ১৩হাজার স্বর্ণমুদ্রা

৫. মুনি-ঋষিদের কাছে আমরা শিখি –

ক) সহনশীলতা　　খ) সহমর্মিতা

গ) নিয়মানুবর্তিতা　　ঘ) কর্তব্যপরায়ণতা

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. কাদের ঋষি বলা হয়?

২. পাঁচজন বিখ্যাত মুনি-ঋষির নাম লেখ?

৩. ব্রহ্মবিদ্যা কী?

৪. বশিষ্ঠ মুনিকে মৈত্রাবরুণি বলা হয় কেন?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর প্রশ্ন দুটির উত্তরে কী বলেছিলেন?

২. গার্গীকে কেনো ব্রহ্মবাদিনী বিদুষী বলা হয়?

৩. বশিষ্ঠ মুনির জীবনাচরণ থেকে যেসব শিক্ষা গ্রহণ করা যায় সেগুলো লেখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী

জগতে বিভিন্ন ধরনের মানুষ রয়েছেন। কেউ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কেউ অপরের কথা ভাবেন, অপরের সুখ-শান্তির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেন। অন্যের মঙ্গল এবং জগতের কল্যাণই যেন তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। আজীবন তাঁরা মানুষ তথা জগতের উপকার করে যান। তাঁরাই মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী। আগের শ্রেণিতে আমরা কয়েকজন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী সম্পর্কে জেনেছি। এই শ্রেণিতে আমরা মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব ও মহীয়সী নারী রাণী রাসমণির জীবনী সম্পর্কে জানব।

শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্য ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা শচীদেবী। জগন্নাথ মিশ্রের পৈতৃক নিবাস ছিল বাংলাদেশের শ্রীহট্ট (বর্তমান সিলেট)। ছোটবেলায় তাঁর নাম ছিল নিমাই। এই নিমাই-ই পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেব নামে খ্যাত হন।

নিমাইয়ের বয়স যখন দশ-এগারো, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। মা শচীদেবী কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে খুব বিপদে পড়েন। বালক নিমাই ছিলেন খুব চঞ্চল ও দুরন্ত তবে খুবই মেধাবী। শচীদেবী তাঁকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে ভর্তি করে দেন। তাঁর মেধা ও ভক্তিভাবের কারণে সকলেই তাঁকে স্নেহ করতেন। পড়াশুনায় তিনি ছিলেন খুবই নিষ্ঠাবান। তাই অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, অলংকার, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ষোলো বছর বয়সেই তিনি 'পণ্ডিত নিমাই' বলে সারাদেশে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এ সময় তিনি একটি টোল খুলে ছাত্র পড়াতে শুরু করেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পুত্রের এই খ্যাতিতে মা শচীদেবী খুবই খুশি হন। এভাবে নিমাইয়ের সুখেই দিন কাটছিল।

হঠাৎ তাঁর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি অধ্যাপনা, সংসারধর্ম সব ছেড়ে দিয়ে শুধু কৃষ্ণনাম করতে থাকেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, অদ্বৈতাচার্য প্রমুখ।

নিমাই তাঁর অনুসারীদের নিয়ে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে, এমনকি গ্রামের পথে-পথে কৃষ্ণনাম প্রচার করতে থাকেন। এতে অবশ্য অনেকে ক্ষুব্ধ হন। অনেকে বাধাও দেন। জগাই-মাধাই নামে মাতাল দুই ভাই একদিন নিমাই ও নিত্যানন্দকে আক্রমণ করেন। জগাই-মাধাই ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের দিকে কলসির কানা ছুঁড়ে মারেন। এতে নিত্যানন্দের কপাল কেটে রক্ত পড়তে থাকে। নিমাই তখন বলে ওঠেন–"মেরেছিস কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবো না!" এভাবে নিমাই প্রেমভক্তি দিয়ে সবাইকে আপন করে নেন।

তারা সকলে নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন। তারা নিমাইয়ের এ প্রেমভক্তি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। তিনি কোনো ভেদাভেদ মানেননি। তাঁর প্রেমভক্তির উদারতায় কোনো উচ্চ-নিচ, বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতার স্থান ছিল না। তিনি সবাইকে নিজের বুকে স্থান দিয়েছেন। নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও চণ্ডালদের সঙ্গে বসে একসারিতে আহার করতেন। এভাবেই তিনি সবাইকে তাঁর প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে আপন করে নিয়েছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম ও প্রেম প্রচার করার অদম্য স্পৃহা তাঁকে ধীরে ধীরে সংসার বিমুখ করে তোলে। তিনি সংসার ত্যাগ করার সংকল্প করেন। তারপর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের এক গভীর রাতে তিনি মা, স্ত্রী এবং ভক্তদের ছেড়ে গৃহত্যাগ করেন।

শ্রীচৈতন্য নীলাচলে অবস্থানকালে প্রায়শই কৃষ্ণনামে বিভোর হয়ে থাকতেন। এমন বিভোর অবস্থায় ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ জুন তারিখে তিনি পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন। হঠাৎ মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সকল ভক্ত বাইরে তাঁর জন্য উন্মুখ হয়ে বসে থাকেন। তারপর দরজা খুলে তাঁকে আর দেখা যায় না। ভেতরে শুধু জগন্নাথদেবের মূর্তি। ভক্তদের ধারণা, শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদেবের দেহে বিলীন হয়ে গেছেন।

রাণী রাসমণি

রাণী রাসমণি ছিলেন মানবদরদী জমিদার। তিনি লোকমাতা নামেও পরিচিত। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন কলকাতার হালিশহরের নিকটে কোনা নামক গ্রামে। পিতা হরেকৃষ্ণ দাস ও মাতা রামপ্রিয়া দাসী। জন্মের পর মা রামপ্রিয়া দাসী মেয়ের নাম রাখেন রাণী। পরে তাঁর নাম হয় রাণী রাসমণি। দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার পেশা ছিল কৃষিকাজ ও গৃহনির্মাণ। মাত্র সাত বছর বয়সে রাণী মাকে হারান।

১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে রাণী রাসমণির বিয়ে হয়। তাঁদের চার কন্যা ছিল– পদ্মমণি, কুমারী, করুণা ও জগদম্বা। রাজচন্দ্র দাস ছিলেন অত্যন্ত কর্মকুশলী, বিনয়ী ও উদার প্রকৃতির মানুষ। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে স্বামীর মৃত্যুর পর রাণী রাসমণি স্বহস্তে তাঁর জমিদারির ভার তুলে নেন। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে জমিদারি পরিচালনা করেন। জমিদার হয়েও রাণী রাসমণি সাধারণ বাঙালি হিন্দু বিধবার মতো জীবনযাপন করতেন।

রাণী রাসমণি অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পুরীর জগন্নাথ মন্দির সংস্কার। একবার তিনি পুণ্যভূমি জগন্নাথ-তীর্থে যান। সেখানকার জরাজীর্ণ রাস্তায় তীর্থযাত্রীদের চলাচল করতে খুব কষ্ট হতো। তাঁদের কষ্ট দেখে রাণী রাসমণি সম্পূর্ণ রাস্তা সংস্কার করেন। তিনি দেবতাদের জন্য মুকুটও তৈরি করেন। মুকুটগুলো ছিল হীরকখচিত।

রাণী রাসমণি খুব তেজস্বী ছিলেন। একবার ইংরেজ সরকার গঙ্গায় জেলেদের মাছ ধরার ওপর জলকর আরোপ করে। জেলেদের কর দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। তারা রাণী রাসমণির কাছে যায়। রাসমণি টাকা দিয়ে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে গঙ্গার ইজারা নেন। ইংরেজরা আপস-মীমাংসা করতে বাধ্য হন। জেলেরা কর ছাড়া মাছ ধরার অধিকার পেয়ে খুব আনন্দিত হয়।

রাণী রাসমণির উল্লেখযোগ্য অবদান হলো দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির নির্মাণ। তাছাড়া তিনি তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে সুবর্ণরেখা নদী থেকে পুরী পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণ করেন। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে রাণীমা প্রতিদিন পূজা দিতেন। একসময় গদাধর নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ মন্দিরের পুরোহিতের দায়িত্ব পান। তিনিই পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। রামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি রাণী রাসমণি পরলোকগমন করেন।

রাণী রাসমণির জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যাঁরা মহীয়সী নারী, তাঁরা জাতি-ধর্ম সবকিছুর উর্ধ্বে। মানবসেবার জন্য তাঁদের জন্ম। তাই তাঁরা শুধু দেশের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। গোটা বিশ্বই তাঁদের দেশ। সকল মানুষ তাঁদের আপন। মানবসেবাই হচ্ছে তাঁদের মূল লক্ষ্য। আমরা এই শিক্ষা মনে রাখব এবং আমাদের জীবনে তা অনুসরণ করব।

নিচের তথ্যগুলো অনুসরণ করে একজন মহীয়সী নারীর জীবন-প্রবাহ তৈরি করো:

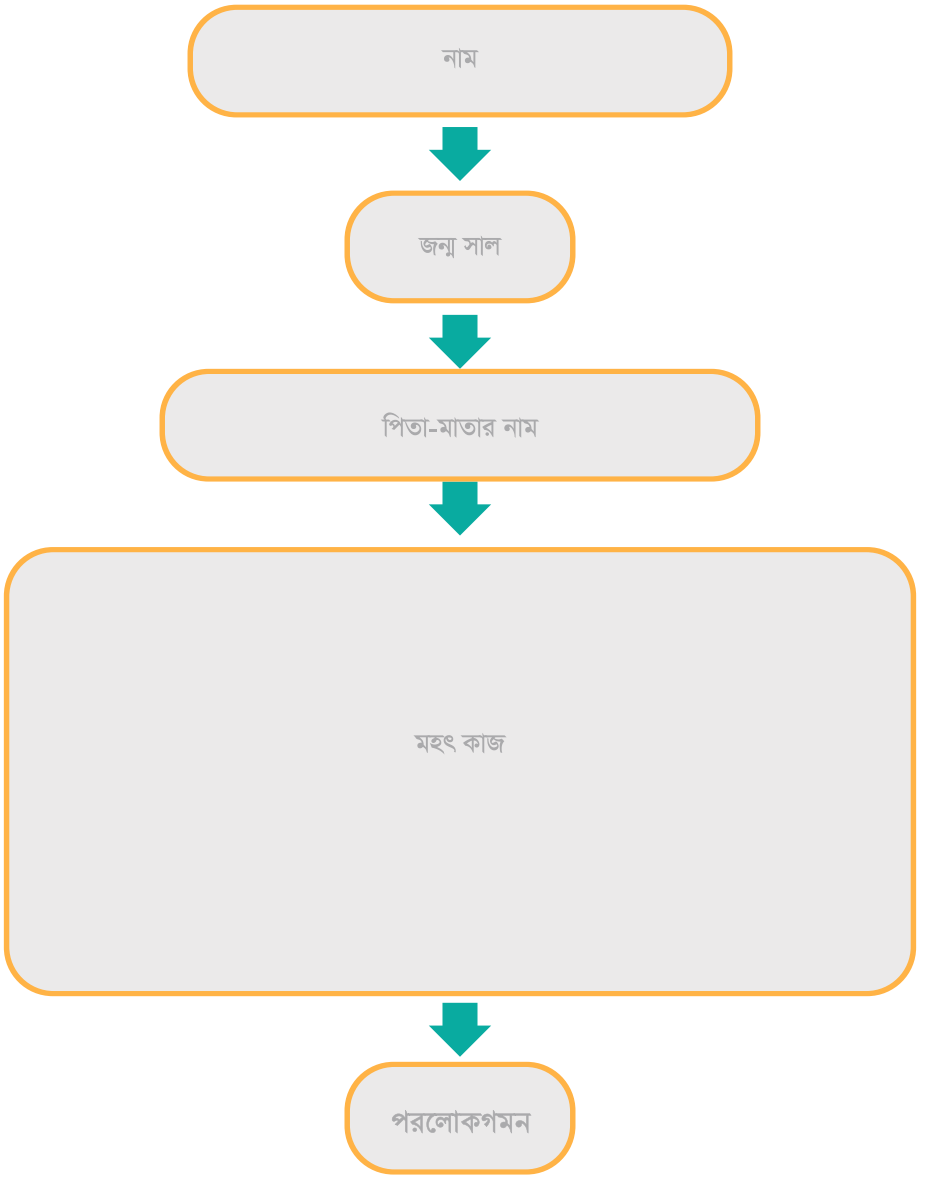

রাণী রাসমণির আদর্শ অনুসরণ করে বন্ধু, পরিবার, সমাজের কল্যাণে তুমি কী করতে চাও লেখ:

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

অনুশীলনী

ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. ছোটবেলায় শ্রীচৈতন্যদেবের নাম ছিলো --------- ।
২. বালক নিমাই ছিলেন খুব চঞ্চল ও দুরন্ত তবে খুবই -------------।
৩. ------------ তিনি ছিলেন খুবই নিষ্ঠাবান।
৪. রাণী রাসমণি ছিলেন ------- জমিদার।

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. বিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি	রাণীমা প্রতিদিন পূজা দিতেন।
২. নিমাই প্রেমভক্তি দিয়ে	সবাইকে আপন করে নেন।
৩. রাণী রাসমণি	নবদ্বীপ গিয়েছিলেন।
৪. দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে	লোকমাতা নামেও পরিচিত।
	কলকাতায় গিয়েছিলেন।

গ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. রাণী রাসমণি জন্মগ্রহণ করেন –

ক) ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর
খ) ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর
গ) ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর
ঘ) ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর

২. রাণীমা প্রতিদিন পূজা দিতেন –

ক) দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে
খ) কালীঘাট মন্দিরে
গ) ঢাকেশ্বরী কালীমন্দিরে
ঘ) রমনা কালীমন্দিরে

৩. মাতা শচীদেবী নিমাইকে কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করান?

ক) গুরুগৃহ
খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ) চতুষ্পাঠী
ঘ) টোল

৪. নিমাই পরবর্তীকালে কী নামে খ্যাত হন?

ক) শ্রীচৈতন্যদেব
খ) স্বরূপানন্দ
গ) বিবেকানন্দ
ঘ) রামকৃষ্ণ

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. নিমাই কোন কোন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন?
২. শচীদেবী কেন নিমাইয়ের প্রতি খুশি হয়েছিলেন?
৩. রাণী রাসমণির তিনটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লেখ?
৪. তীর্থযাত্রীদের জন্য রাণী রাসমণি কী তৈরি করেছিলেন?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. রাণী রাসমণির দুইটি জনহিতকর কাজের বর্ণনা দাও?
২. ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ জুন তারিখে জগন্নাথদেবের মন্দিরে কী ঘটনা ঘটেছিল?
৩. শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণনাম প্রচারে কী কী বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন?
৪. রাণী রাসমণির জীবনী থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?
৫. জেলেদের উপকারের জন্য রাণী রাসমণি কী কাজ করেছিলেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জীবনাদর্শ অনুসরণ

আমরা বিদুষী গার্গী ও বশিষ্ঠ মুনি, মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব ও মহীয়সী নারী রাণী রাসমণি সম্পর্কে জেনেছি। তাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আমাদের জীবনকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনা করব। উদার ও দায়িত্বশীল হব। সুশৃঙ্খল এবং পবিত্র জীবনযাপন করব। মানুষ ও জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করব।

বিদুষী গার্গী ও বশিষ্ঠ মুনির জীবনের দুটি করে উল্লেখযোগ্য দিক লেখ:

বিদুষী গার্গী	বশিষ্ঠ মুনি
১.	১. ... ...
২.	২. ... ...

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনাদর্শ থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই:

- জ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করা।
- পড়ালেখায় নিষ্ঠাবান হওয়া।
- মানুষে মানুষে ভেদাভেদ না করা।
- প্রেমভক্তি দিয়ে সকলকে আপন করে নেওয়া।
- ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা স্থাপন করা।
- সমাজের উচ্চ-নিচ জাতি-গোত্রের বিভেদ না করা।
- কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হওয়া।

রাণী রাসমণির জীবনাদর্শ থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই:

- গুরুজনকে সম্মান করা।
- তাঁদের কথা মেনে চলা।
- সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখা।
- সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।
- জনসেবামূলক কাজের মনোভাব গড়ে তোলা।
- দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান হওয়া।
- জ্ঞান অর্জন করা।
- একে অপরকে সাহায্য করা।
- উদার ও বিনয়ী হওয়া।

আমরা শ্রীচৈতন্যদেব ও রাণী রাসমণির জীবনাদর্শ অনুসরণ করব। সকলের প্রতি ভালো আচরণ করব। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর কাজ করব।

শ্রীচৈতন্যদেব ও রাণী রাসমণির তিনটি করে কাজের নাম লেখ, যা দ্বারা সমাজ উপকৃত হয়েছিল:

শ্রীচৈতন্যদেব	রাণী রাসমণি
১. …	১. …
২. …	২. …
৩. …	৩. …

তোমার করা যেকোনো একটি ভালো কাজের বর্ণনা দাও:

… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

অনুশীলনী

ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. সকল ধর্মের প্রতি ---------- থাকা।
২. মানুষে মানুষে ---------- না করা।
৩. নিত্যানন্দ ছিলেন নবদ্বীপের একজন ----------।

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম ছিল	শ্রদ্ধাশীল থাকা।
২. নিমাই ছিলেন বাবা-মায়ের	একমাত্র সন্তান।
৩. সকল ধর্মের প্রতি	তপোবনে।
	কনিষ্ঠ পুত্র।

গ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনাদর্শ থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

ক) ঐক্যবদ্ধ হওয়া — খ) বিচ্ছিন্ন থাকা
গ) মানুষে মানুষে ভেদাভেদ না করা — ঘ) অন্যকে বিপদে ফেলা।

২. 'বেদে প্রশ্ন করার একটা সীমা নির্দেশ করা হয়েছে'– কথাটি কে বলেছেন?

ক) যাজ্ঞবল্ক্য — খ) গার্গী
গ) জনক রাজা — ঘ) লোপামুদ্রা

৩. উদার ও বিনয়ী হওয়া এই শিক্ষা আমরা কার কাছে পাই?

ক) রাণী রাসমণি — খ) শ্রীচৈতন্যদেব
গ) রাজচন্দ্র দাস — ঘ) জনক রাজা

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. মহাপুরুষ ও মহীয়সীদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আমরা কী কী করব?
২. নবদ্বীপের পাঁচজন বৈষ্ণবের নাম লেখ।

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনাদর্শ থেকে পাঁচটি শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করো।
২. রাণী রাসমণির জীবনাদর্শ থেকে পাঁচটি শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করো।

তৃতীয় অধ্যায়

নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি

প্রথম পরিচ্ছেদ

ত্যাগ

এসো একটি গল্প পড়ি :

পার্থ চতুর্থ শ্রেণির একজন ছাত্র। সে একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। তখন ছিল শীতকাল। পথে একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখতে পেল। দরিদ্র ব্যক্তিটির সাথে পার্থর সমবয়সী একটি শিশু ছিল। তার পরনে কোনো শীতের কাপড় ছিল না। শিশুটি তীব্র শীতে কাঁপছিল। পার্থ একটি নতুন সোয়েটার পরেছিল। সোয়েটারটি তার মামা মাত্র কয়েক দিন আগে বিদেশ থেকে এনে দিয়েছেন। সোয়েটারটি পার্থর খুব পছন্দ হয়েছে। সে একটু ভাবল। তারপর তার পরনের সোয়েটারটি খুলে শিশুটিকে পরতে দিল। পার্থ তার প্রিয় জিনিসটি দিয়ে দিতে একটুও পিছপা হলো না। শিশুটি পার্থর সোয়েটার পরে শীত থেকে রক্ষা পেল। সে ও তার বাবা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে

পার্থর দিকে তাকিয়ে রইল। পার্থ সোয়েটার ছাড়া বাড়ি এলে মা জিজ্ঞাসা করলেন, সোয়েটার কোথায়? সে তখন সব ঘটনা খুলে বলল। মা প্রথমে কিছুটা রাগ করলেন। পরে মানুষের প্রতি পার্থর উপকারের মনোভাব বুঝতে পারলেন। পার্থর এই ত্যাগ করার মানসিকতা দেখে মা আনন্দিত হলেন। এই আচরণের মধ্য দিয়ে অন্যের জন্য ত্যাগ করার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

ত্যাগ একটি নৈতিক ও মানবিক গুণ। ধর্মেরও অঙ্গ। ত্যাগ হলো নিজের স্বার্থ না দেখে অন্যের স্বার্থ দেখা। কেবল নিজের চিন্তা না করে অন্যের ভালোর জন্য কাজ করা। অনেকভাবেই ত্যাগ করা যেতে পারে। অন্যের ভালোর জন্য, জীবের কল্যাণের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য। যার ত্যাগ করার মানসিকতা আছে তিনি মানুষ ও দেশের জন্য জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারেন। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। দেশের জন্য আত্মত্যাগ করে তাঁরা অমর হয়ে আছেন।

অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে তুমি যে যে কাজ করো লেখ:

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

আমাদের ধর্মগ্রন্থে অনেক নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মুনি-ঋষির কথা বলা হয়েছে। দধীচি নামে একজন মুনি ছিলেন। যিনি ত্যাগের জন্য অমর হয়ে আছেন। দধীচি মুনি শিবের উপাসনা করতেন। তিনি সব সময় জীবের মঙ্গল চিন্তা করতেন। জীবের দুঃখ দূর করার জন্য শিবের নিকট প্রার্থনা করতেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

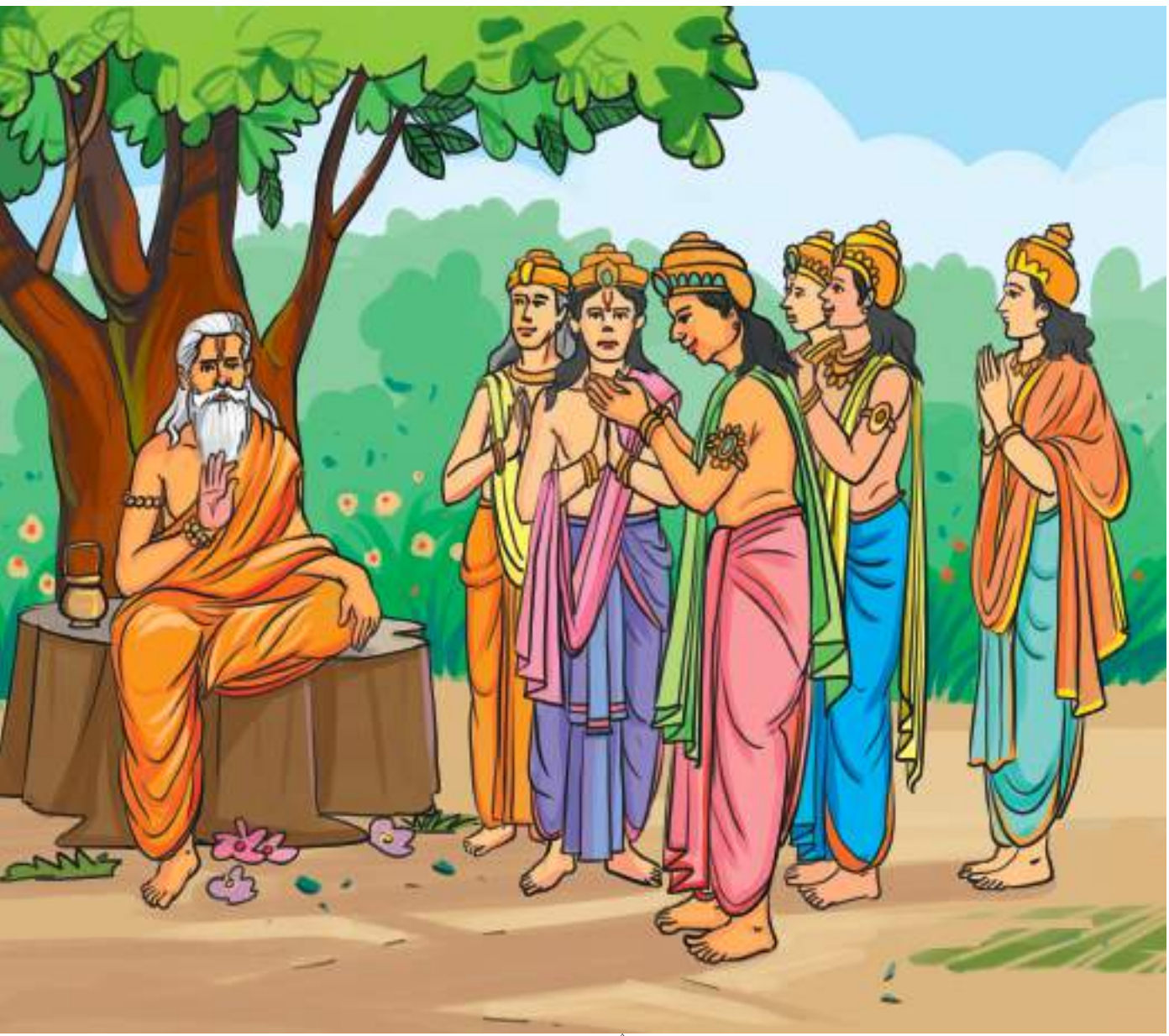

সে সময় বৃত্রাসুর নামে এক পরাক্রমশালী অসুর ছিল। সে কঠোর তপস্যা করে শিবের বর লাভ করে। কোনো অস্ত্রেই তার মৃত্যু হবে না। বর লাভ করে বৃত্রাসুর পৃথিবী দখল করে ফেলে। একদিন সে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করল। স্বর্গরাজ ইন্দ্র যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। বৃত্রাসুর স্বর্গের রাজা হলো। স্বর্গের রাজা হয়ে বৃত্রাসুর দেবতাদের উপর অত্যাচার করতে লাগল। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা শিবের শরণাপন্ন হলেন। তিনি দেবতাদের বললেন, "দেবগণ, বৃত্রাসুর আমার বর লাভ করেই শক্তিশালী হয়েছে। তাই আমি নিজ হাতে তাকে বধ করতে পারব না। আপনারা বিষ্ণুলোকে গমন করুন, বিষ্ণুই আপনাদের সাহায্য করবেন।"

দেবতারা বিষ্ণুলোকে গিয়ে কাতরভাবে ভগবান বিষ্ণুর স্তব-স্তুতি শুরু করলেন। এতে ভগবান বিষ্ণুর দয়া হলো। তিনি দেবতাদের দেখা দিয়ে বললেন, "একমাত্র দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা নির্মিত অস্ত্রেই বৃত্রাসুর নিহত হবে। তাকে বধ করার অন্য কোনো উপায় নেই।" ভগবান বিষ্ণুর উপদেশ শুনে ইন্দ্র দেবতাদের নিয়ে তৎক্ষণাৎ দধীচি মুনির কাছে গেলেন। দধীচি মুনি সবাইকে সমাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। ইন্দ্র দধীচি মুনির নিকট সব ঘটনা খুলে বললেন। দেবতারা দধীচি মুনির নিকটে তাঁর অস্থি প্রদানের জন্য বিনীত প্রার্থনা করলেন। দধীচি মুনি ত্যাগের প্রতিমূর্তি। তাই তিনি বললেন, "দেহ জীবের প্রিয় বস্তু হলেও একদিন সবাইকে তা ত্যাগ করতেই হবে। তাই এই তুচ্ছ দেহ দিয়ে যদি আপনাদের উপকার হয়, তবে আমার জীবন ধন্য মনে করব। এই নশ্বর দেহ দ্বারা আপনাদের দুঃখ দূর করার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ হব।"

এই বলে দধীচি মুনি তখনই যোগবলে দেহত্যাগ করেন। ভগবান বিষ্ণুর দূত এসে তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যান। দেবতারা পরমানন্দে ধন্য ধন্য করে দধীচি মুনির দেহ থেকে অস্থি নিয়ে আসেন। স্বর্গের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বিশ্বকর্মাকে দিয়ে বজ্রাস্ত্র প্রস্তুত করান। দেবরাজ ইন্দ্র সেই বজ্রাস্ত্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে হত্যা করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করেন।

দধীচি মুনি তাঁর আত্মত্যাগের দ্বারা পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন।

নিচের নামগুলো দিয়ে একটি করে বাক্য লেখ:

দধীচি	
বৃত্রাসুর	
ইন্দ্র	
শিব	
বিশ্বকর্মা	

দধীচি মুনির আত্মত্যাগের কাহিনি থেকে তুমি যা শিখেছ লেখ:

… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …

অনুশীলনী

ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. ত্যাগ একটি নৈতিক ও ---------- গুণ ।

২. পার্থ ---------- শ্রেণির একজন ছাত্র।

৩. তিনি সবসময় জীবের ---------- চিন্তা করতেন।

৪. দধীচি মুনি জীবের দুঃখ দূর করার জন্য ---------- নিকট প্রার্থনা করতেন।

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. পার্থ একটি নতুন	অন্যের স্বার্থ দেখা ।
২. ত্যাগ হলো নিজের স্বার্থ না দেখে	তাঁরা অমর হয়ে আছেন ।
৩. দেশের জন্য আত্মত্যাগ করে	সোয়েটার পরেছিল ।
৪. বৃত্রাসুর নামে এক	পরাক্রমশালী অসুর ছিল।
	দেহত্যাগ করেন।

গ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√)দাও :

১. ত্যাগ কীসের অঙ্গ?

(ক) পূজার (খ) উপাসনার (গ) ধর্মের (ঘ) আরাধনার

২. মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল –

(ক) ১৯৮০ সালে (খ) ১৯৮৭ সালে

(গ) ১৯৭৫ সালে (ঘ) ১৯৭১ সালে

৩. দধীচি মুনি কার উপাসনা করতেন?

(ক) ব্রহ্মার (খ) শিবের (গ) বিষ্ণুর (ঘ) দুর্গার

৪. বৃত্রাসুর কে ছিল ?

(ক) মহাপুরুষ (খ) অসুর (গ) দেবতা (ঘ) মানুষ

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. পার্থ তার সোয়েটার শিশুটিকে কেন দিয়েছিল?
২. বৃত্রাসুর কার তপস্যা করত ?
৩. দেবতারা বিষ্ণুলোকে কার স্তুতি করলেন ?
৪. দেবতারা দধীচি মুনির নিকট কী প্রার্থনা করলেন?
৫. দধীচি মুনি পৃথিবীতে কেন অমর হয়ে আছেন ?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. দধীচি মুনি সম্পর্কে তোমার ধারণা পাঁচটি বাক্যে লিখ।
২. বৃত্রাসুর কীভাবে স্বর্গের রাজা হলো?
৩. দেবতাদের উদ্দেশ্যে দধীচি মুনির উক্তি নিজের ভাষায় লেখ।
৪. ত্যাগ কী? ত্যাগের সাথে ধর্মের সম্পর্ক লেখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উদারতা

এসো একটি গল্প পড়ি:

তপতী দূর থেকে বোর্ডের লেখা দেখতে পায় না। কিন্তু সামনের বেঞ্চে বসলে সে বোর্ডের লেখা দেখতে পায়। একদিন সে সামনের বেঞ্চে বসার জায়গা পায়নি। শিক্ষক বোর্ডে একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে সবাইকে তা খাতায় তুলে নিতে বললেন। কিন্তু তপতী লিখতে পারছিল না। তখন শিক্ষক বললেন, তুমি লিখছ না কেন? তপতী বলল, স্যার আমি বোর্ডের লেখা ঠিকমতো দেখতে পারছি না। এই কথা শুনে সামনের বেঞ্চের একজন শিক্ষার্থী অনিমা দাঁড়িয়ে বলল, স্যার আমি ওর জায়গায় বসতে পারি, ও আমার জায়গায় বসতে পারে। আমি ওখান থেকেই লিখতে পারব। তখন তপতী সামনের বেঞ্চে বসে লিখতে লাগল।

উদার মনোভাবের জন্যই অনিমা তার জায়গায় তপতীকে বসতে দিল। এই ঘটনা থেকে অন্য শিক্ষার্থীরা উদারতার শিক্ষা পেল।

অনিমার উদারতার মতো আরও উদাহরণ লেখ:

উদার ব্যক্তির গুণ হচ্ছে উদারতা। কোনো কিছুর প্রত্যাশা না করে অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করাই হচ্ছে উদারতা। উদারতা মানুষের একটি মহৎ গুণ। ধর্মের অঙ্গ। উদার ব্যক্তি অন্যের ভালোর জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করেন। উদার ব্যক্তির নিকট সকল মানুষ সমান। তাঁরা কাউকে ছোটো বা বড়ো মনে করেন না। সবাইকে আপন মনে করেন। হিতোপদেশে বলা হয়েছে– "উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।" অর্থাৎ উদার ব্যক্তিদের নিকট পৃথিবীর সকলেই আত্মীয়।

তোমার দেখা বা জানা একজন উদার ব্যক্তির নাম লেখ। কেন তাঁকে উদার মনে হয়েছে?

… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …

এখন আমরা মহাভারতের বনপর্বের ঘোষযাত্রা ঘটনাটি জানব।

মহাভারতের কাহিনি আমরা জানি। দুর্যোধনদের বলা হয় কৌরব। আর যুধিষ্ঠিরদের বলা হয় পাণ্ডব। কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে রাজ্যের অধিকার নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ ছিল। দুর্যোধনদের চক্রান্তে পঞ্চপাণ্ডব বনে যেতে বাধ্য হন। পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠিয়েও দুর্যোধনের মনে শান্তি নেই। পাণ্ডবরা কতটা দুঃখ-কষ্টে আছে এটা দেখাই তাঁর ইচ্ছা। পাণ্ডবরা দুঃখ-কষ্টে থাকলেই দুর্যোধনের শান্তি। দুর্যোধনকে উৎসাহ দিচ্ছেন তাঁর ভাই দুঃশাসন। কুচক্রী মামা শকুনি। আর বন্ধু কর্ণ। এখন প্রয়োজন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নেওয়া। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের পিতা। তিনি জন্মান্ধ। তাঁকে অসৎ উদ্দেশ্য জানানো যাবে না। কারণ সত্য কথা বললে তিনি অনুমতি দেবেন না। তখন ধৃতরাষ্ট্রকে বলা হলো, তাঁরা ঘোষযাত্রায় যাবেন। কেননা তখন পঞ্চপাণ্ডব স্ত্রী দ্রৌপদীসহ দ্বৈতবনে বাস করছিলেন। দ্বৈতবনের এক প্রান্তে ঘোষ অর্থাৎ গো-পালকদের বাসস্থান। গরু গণনা করা এবং দেখাশোনা করা কৌরবদের একটা দায়িত্ব ছিল। গরুগুলো কেমন অবস্থায় আছে এটা দেখাও তাঁদের কাজ ছিল। দুর্যোধনরা সস্ত্রীক ঘোষদের বাসস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। প্রত্যেকেরই পরিধানে উজ্জ্বল পোশাক। বহু মূল্যবান অলংকার। আর সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত হাতি-ঘোড়াতো আছেই। ঘোষযাত্রায় গিয়ে তাঁরা খুব আমোদ-প্রমোদ করতে লাগলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কাছেই ছিল বিরাট এক সরোবর। সেখানে গন্ধর্বরা তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে স্নান উৎসব করছিলেন। দুর্যোধনরা সেখানে গিয়ে তাদের উৎসবে বিঘ্ন সৃষ্টি করলেন। গন্ধর্বরা রেগে গেলেন। তখন গন্ধর্বদের প্রধান চিত্ররথ দুর্যোধনদের আক্রমণ করলেন। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হলো। দুর্যোধনরা পরাজিত হলেন।

চিত্ররথ দুর্যোধনদের স্ত্রীসহ বন্দি করলেন। পরাজিত কয়েকজন সৈনিক এবং সঙ্গী পালিয়ে এলেন। তাঁরা নিকটে বসবাসকারী পাণ্ডবদের এ ঘটনা জানালেন। ভীম ও অর্জুন বললেন, দুরাচার দুর্যোধনের ঠিক শাস্তি হয়েছে। কিন্তু যুধিষ্ঠির বললেন, দুর্যোধন তাদেরই জ্ঞাতিভাই। তাই তারা অন্যায় করলেও তাদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। যদিও যুধিষ্ঠিরদের সকল দুর্দশার কারণ দুর্যোধন। তারপরেও যুধিষ্ঠির চার ভাইকে আদেশ দিলেন দুর্যোধনকে রক্ষা করতে। তখন তাঁরা গন্ধর্বদের হাত থেকে দুর্যোধনসহ সকলকে উদ্ধার করলেন। দুর্যোধন এসে যুধিষ্ঠিরের কাছে ক্ষমা চাইলেন। যে দুর্যোধনরা পাণ্ডবদের সবসময় বিপদে ফেলেছেন যুধিষ্ঠির হাসিমুখে তাঁদের ক্ষমা করলেন।

চরম শত্রু কুচক্রী দুর্যোধনদের বিপদ থেকে রক্ষা করলেন যুধিষ্ঠির। তিনি উদারতার পরিচয় দিলেন।

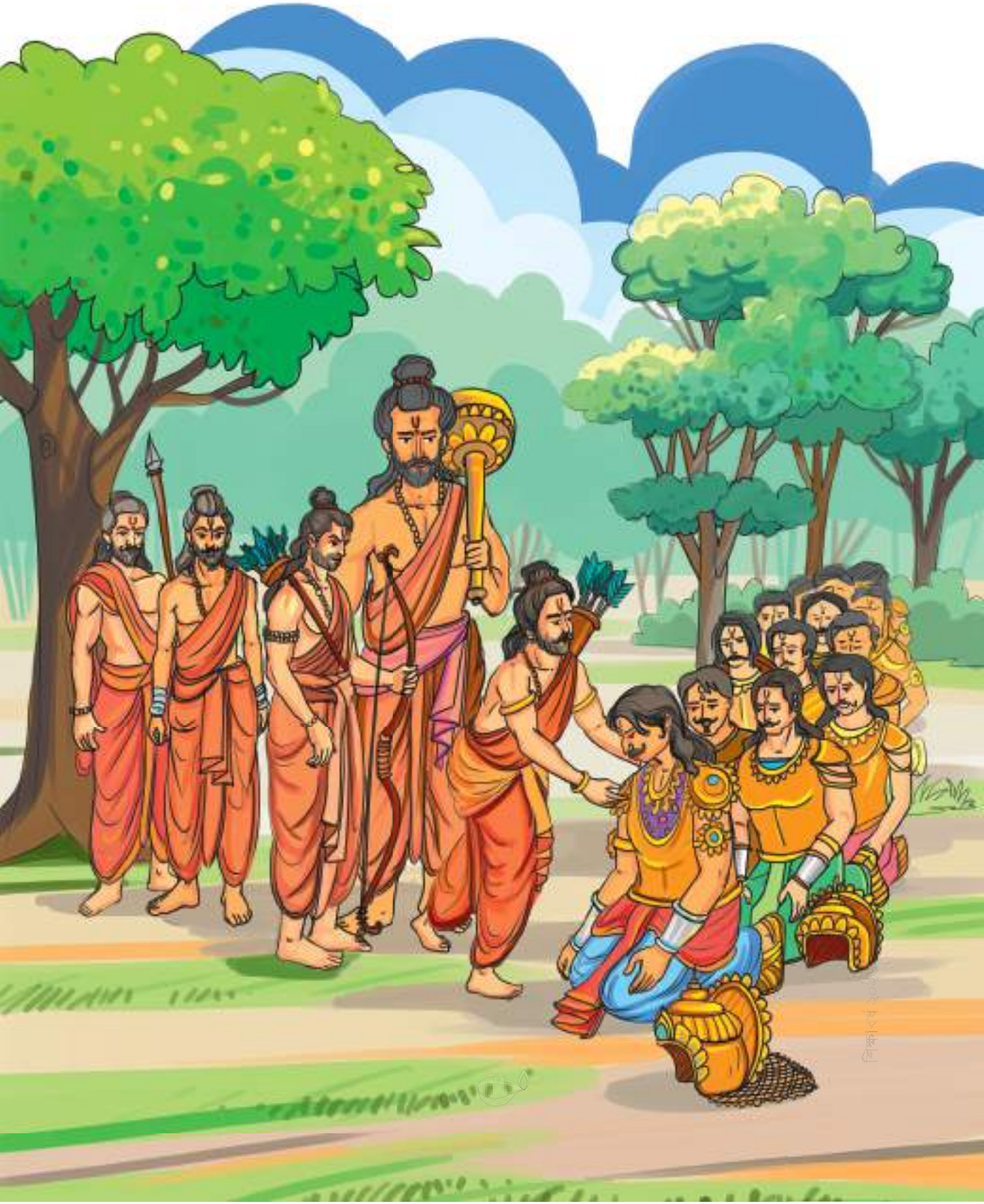

‘উদারতা একটি মহৎ গুণ’– মহাভারতের এই গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করো:

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

অনুশীলনী

ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. দুর্যোধনদের বলা হয় -------------।

২. ------------ দুর্যোধনের পিতা।

৩. চিত্ররথ -------------- স্ত্রীসহ বন্দী করলেন।

৪. কুচক্রী মামা ---------------।

৫. ------------ পরাজিত হলেন।

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. ঘোষ যাত্রায় গিয়ে তাঁরা	ভীষণ যুদ্ধ হলো।
২. দুই পক্ষে	চিত্ররথ।
৩. দুর্যোধনদের বিপদ থেকে	খুব আমোদ-প্রমোদ করতে লাগলেন।
৪. পাণ্ডবদের সবসময় বিপদে ফেলতেন	রক্ষা করলেন যুধিষ্ঠির।
৫. গন্ধর্বদের প্রধান ছিলেন	কৌরবরা।
	দ্রৌপদী

গ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. দুর্যোধনকে উৎসাহ দিতেন তাঁর ভাই –

(ক) দুঃশাসন (খ) শকুনি (গ) কর্ণ (ঘ) ভীম

২. গন্ধর্বরা কাদের নিয়ে স্নান উৎসব করেছিলেন?

(ক) সন্তানদের নিয়ে (খ) স্ত্রীদের নিয়ে

(গ) ভাইদের নিয়ে (ঘ) রাজাদের নিয়ে

৩. যুধিষ্ঠিরদের বলা হয় –

(ক) পাণ্ডব (খ) কৌরব (গ) শকুনী (ঘ) কর্ণ

৪. ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র হলেন –

(ক) যুধিষ্ঠির (খ) অর্জুন (গ) দুর্যোধন (ঘ) ভীম

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. পাণ্ডব কাদের বলা হয়?

২. কাদের চক্রান্তে পাণ্ডবদের বনে যেতে হয়?

৩. কে জন্মান্ধ ছিলেন ?

৪. দ্বৈত বনের প্রান্তে কাদের বাসস্থান ?

৫. গন্ধর্ব প্রধান চিত্ররথ কাদের আক্রমণ করলেন?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. ঘোষযাত্রায় স্থানীয় বাসিন্দারা কেন অতীষ্ঠ হয়ে উঠল ?

২. যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে রক্ষা করতে তাঁর চার ভাইকে আদেশ দিলেন কেন?

৩. যুধিষ্ঠিরের উদারতা দেখে দুর্যোধন কী করলেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরমতসহিষ্ণুতা

চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাদের বিদ্যালয়ে একটি ফুলের বাগান করবে ঠিক করল। তারা সবাই মিলে পরিকল্পনা করতে বসল। প্রথমেই আলোচনা হলো কী কী ফুলগাছ লাগানো যায়? কেউ বলল বড়ো ফুলগাছের কথা। আবার কেউ বলল ছোটো ফুলগাছের কথা। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন মতামত এলো। যদি একদল আরেক দলের মতামত মেনে নেয় তাহলেই সমাধান হয়ে যায়। কিংবা দুই দলের কথা রাখা গেলেও মীমাংসা হতে পারে। বড়ো গাছ লাগালে শ্রেণিকক্ষ অন্ধকার হয়ে যাবে। তাই সবাই ছোটো গাছ লাগানোর বিষয়ে একমত হলো। এভাবে শিক্ষার্থীরা একে অন্যের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

সহিষ্ণু শব্দের অর্থ সহনশীল বা ধৈর্যশীল। সহিষ্ণুতা অর্থ ধৈর্য ধারণ বা সহ্য করা। পরমত অর্থ পরের মত। পরমতসহিষ্ণুতা অর্থ অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং ধৈর্য ধরে তা সহ্য করা বা গ্রহণ করা। অন্যের মতপ্রকাশের সুযোগ দেওয়া বা অন্যের বাক্‌স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা ও ধর্মের মানুষ রয়েছে। রয়েছে মতের ভিন্নতা। সকলের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শনকে পরমতসহিষ্ণুতা বলে। পরমতসহিষ্ণুতা মানুষের একটি নৈতিক গুণ। ধর্মের অঙ্গ।

বিদ্যালয়ে আর কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা পরমতসহিষ্ণু হতে পারি, দলে আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লেখ:

আমরা পরিবারে বসবাস করি। এখানে একজন অন্যজনের মতের গুরুত্ব দিতে হয়। তা না হলে সংসারে ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকে। কেবল নিজের মতকে বড়ো করে দেখলে হবে না। অন্যের মতকেও গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা যেমন আমাদের ধর্মে বিশ্বাস করি, তেমনি অন্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। বিভিন্ন ধর্মের আলাদা রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু সমাজে আমরা এক সাথে বসবাস করি। নিজ নিজ ধর্ম পালন করি। আমাদের ধর্মে মানুষের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে, অন্য ধর্মেও মানুষের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে।

পরমতসহিষ্ণুতা হলো পারস্পরিক সহাবস্থানের মূলমন্ত্র। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসভায় বলেন, "আমি সেই ধর্মের অংশ হওয়ায় গর্ববোধ করি, যে ধর্ম গোটা বিশ্বকে সহ্যশক্তি ও গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছে। আমরা মনে করি, সকল ধর্মই সত্য। আমি আরও গর্বিত, কারণ আমি সেই দেশের মানুষ, যে দেশ সব ধর্মের মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি।"

বিদ্যালয়ের বাইরে আর কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা পরমতসহিষ্ণু হতে পারি, দলে আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লেখ:

দলগতভাবে পরমতসহিষ্ণুতা অনুশীলন করে একটি শিক্ষাসফর কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে উপস্থাপন করো:

অনুশীলনী

ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. সহিষ্ণু শব্দের অর্থ ----------।
২. পরমতসহিষ্ণুতা মানুষের একটি ----------।
৩. বিভিন্ন ধর্মের আলাদা ---------- ও পদ্ধতি রয়েছে।
৪. সকল ধর্মই ----------।

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. সহিষ্ণুতা অর্থ	ধৈর্যধারণ বা সহ্য করা।
২. পরমতসহিষ্ণুতা	কল্যাণের কথা বলা হয়েছে।
৩. সমাজে আমরা একসাথে	সত্য বলে বিশ্বাস করি।
৪. সকল ধর্মে মানুষের	বসবাস করি।
৫. সকল ধর্মকেই	ধর্মের অঙ্গ।
	শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি।

গ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

(১) শিক্ষার্থীরা অন্যের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে –

(ক) বিরোধ প্রকাশ করে (খ) পরমতসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে

(গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (ঘ) অমত প্রকাশ করে

(২) সহিষ্ণু শব্দের অর্থ –

(ক) উপদেশ (খ) সদাচরণ

(গ) মননশীল (ঘ) সহনশীল

(৩) সমাজে আমরা বাস করি –

(ক) একসাথে (খ) জোড়ায় জোড়ায়

(গ) মিলে-মিশে (ঘ) আলাদা আলাদা

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. পারস্পরিক সহাবস্থানের মূল মন্ত্র কী?

২. স্বামী বিবেকানন্দ কত সালে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসভায় বক্তৃতা করেন?

৩. পরমতসহিষ্ণুতা কাকে বলে?

৪. আমাদের সমাজে কী কী ধরনের মানুষ রয়েছে?

৫. অন্য ধর্মের প্রতি আমরা কেন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসভায় দেওয়া স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য নিজের ভাষায় লেখ।

২. আমরা বিদ্যালয়ে কোন কোন কাজ করার সময় পরমতসহিষ্ণুতা অনুশীলন করতে পারি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর প্রতি ভালোবাসা

নিচের ঘটনাগুলো লক্ষ করো। এসব ক্ষেত্রে তুমি হলে কী করতে লেখ:

ঘটনা	আমি যা করতাম
সবিতা ছোটোবেলায় পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে হাঁটার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাই স্কুলে যেতে তার খুব অসুবিধা হয়। সবিতার বন্ধু অহনা তাকে সাহায্য করে।	
পুলক স্কুলে গিয়ে হইচই করে। উচ্চ স্বরে কথা বলে। ফলে স্কুলের কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। শিক্ষক তাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেন।	
শ্যামল কানে কম শোনে। সে পিছনে বসলে শিক্ষকের কথা শুনতে পারে না। তাই বন্ধুরা তাকে সামনে বসতে দেয়।	
নীলাদ্রি কথা বলতে পারে না। শুনতেও পায় না। তবে পড়তে ও লিখতে পারে। শিক্ষক তাকে লিখে প্রশ্ন করেন।	

যারা শারীরিকভাবে স্বাভাবিক নয়, তারা হলো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ চোখে দেখতে পায় না, কানে শুনতে পায় না, কথা বলতে পারে না, হাঁটা-চলা করতে পারে না। এছাড়াও এমন কিছু শিশু আছে, যাদের বয়স বাড়লেও বুদ্ধি বাড়ে না। তারা শুনে মনে রাখতে পারে না। নিজের জিনিস যত্ন করে রাখতে পারে না। শিশুর জন্মের আগে বা জন্মের সময়ে, এমনকি জন্মের পরেও তাদের এ সমস্যা হতে পারে।

আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু রয়েছে। যেমন: শারীরিক, মানসিক, আবেগীয়, দৃষ্টি, বাক্, শ্রবণ, বুদ্ধি, অটিজম, ডাউন-সিনড্রোম ইত্যাদি। তাদের সমস্যা চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী হিয়ারিং ডিভাইস, চশমা, ক্র্যাচ, হুইলচেয়ার, থেরাপি, বিশেষ যত্ন ইত্যাদি প্রয়োজন। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে

হয়। সরকার এসব শিশুর শিক্ষার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সবিতা ছোটোবেলায় পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়। এতে সে পায়ের স্বাভাবিক নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সবিতার পরিবার ছিল দরিদ্র। শুধু দরিদ্র নয় তারা লেখাপড়াও জানত না। যথাসময়ে সবিতার চিকিৎসা করা হয়নি। ফলে সে পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে যায়। পরিবার তাকে স্কুলে ভর্তিও করেনি। একদিন ঐ এলাকার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সবিতাকে দেখতে পান। তিনি সমস্যাটি বুঝতে পারেন। তিনি সবিতাকে আশ্বস্ত করে বলেন, তুমি শারীরিক সমস্যা জয় করে নিয়মিত স্কুলে যেতে পারবে। প্রধান শিক্ষক সবিতাকে একটি হুইলচেয়ার সংগ্রহ করে দিয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। সবিতা হুইলচেয়ারে করে নিয়মিত স্কুলে যায়। হুইলচেয়ারে তার কিছু সমস্যা হতো। সবিতার বাড়ির কাছেই থাকে অশোক। সে-ও ঐ স্কুলে পড়ে। সে প্রতিদিন স্কুলে যেতে সবিতাকে সাহায্য করে। সকলের উৎসাহ এবং বন্ধুদের সহযোগিতায়

সবিতা পড়ালেখায় বেশ উন্নতি লাভ করতে থাকে। ধীরে ধীরে সে নিজেকে একজন ভালো শিক্ষার্থী হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। প্রতিকূলতা জয় করে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পায়। ভালোবাসা ও সহযোগিতা পেলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরাও সফল হতে পারে।

তাই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ভালোবাসব। তাদের সঙ্গে খেলা করব। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের নিয়ে অংশগ্রহণ করব। এভাবে তাদের প্রতি আমরা সহমর্মিতা প্রকাশ করব।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি তোমার সহযোগিতামূলক আচরণ কী হতে পারে লেখ:

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

অনুশীলনী

ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. কোনো কোনো শিশুর বয়স বাড়লেও ----------- বাড়ে না।
২. সবিতার পরিবার ছিল -----------।
৩. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ------------।

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো।

১. আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের	পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়।
২. সবিতা ছোটোবেলায়	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু রয়েছে।
৩. ফলে সে পুরোপুরি	অংশগ্রহণ করব।
৪. বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের নিয়ে	পঙ্গু হয়ে যায়।
	শিশুদের ভালোবাসব।

গ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

(১) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষার জন্য কেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়?

(ক) সাধারণ ব্যবস্থা (খ) স্বাভাবিক ব্যবস্থা
(গ) অসাধারণ ব্যবস্থা (ঘ) বিশেষ ব্যবস্থা

(২) যথাসময়ে সবিতার কী করা হয়নি?

(ক) আদর (খ) যত্ন
(গ) চিকিৎসা (ঘ) পরিচর্যা

(৩) সবিতা কীভাবে স্কুলে যায়?

(ক) বাসে করে (খ) ট্রেনে করে
(গ) হুইল চেয়ারে করে (ঘ) রিক্সায় করে

(৪) যারা শারীরিকভাবে স্বাভাবিক নয় তারা –

(ক) আনন্দে থাকে (খ) চুপচাপ থাকে
(গ) খুব কষ্টে থাকে (ঘ) লুকিয়ে থাকে

(৫) যারা বাক প্রতিবন্ধী তারা –

(ক) কথা বলতে পারে না (খ) লিখতে পারে না
(গ) ছবি আঁকতে পারে না (ঘ) খেলতে পারে না

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর কয়েকটি ধরণ লেখ।
২. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার জন্য সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?
৩. প্রধান শিক্ষক সবিতাকে কী বলেছিলেন?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলতে কাদের বোঝায়?
২. সবিতা কেন পঙ্গু হয়ে যায়?
৩. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সাথে আমরা কেমন আচরণ করব?

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মগ্রন্থ, দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ, যোগব্যায়াম, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দুধর্মগ্রন্থ

তোমাদের জানা কয়েকটি হিন্দুধর্মগ্রন্থের নাম লেখ:

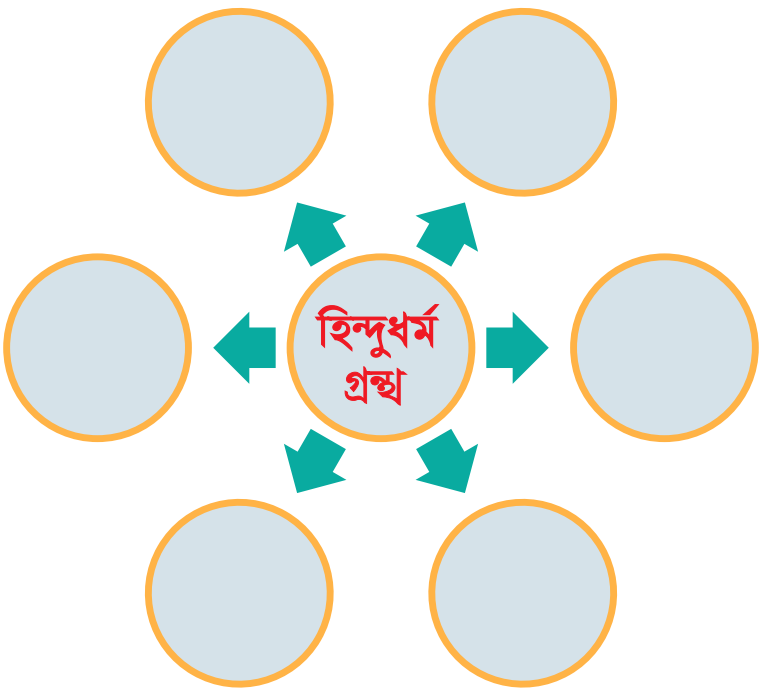

ধর্মের বাণীকে ধারণ করে এমন গ্রন্থই ধর্মগ্রন্থ। হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম ধর্ম। হিন্দুধর্মে রয়েছে অনেক ধর্মগ্রন্থ। যেগুলো হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানের ভাণ্ডার। বেদ আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এছাড়া রয়েছে আরণ্যক, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার মহিমার কথা বলা হয়েছে। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে মানুষকে নৈতিক শিক্ষা ও হিতোপদেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে দুটি ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বেদ

বেদ হিন্দুধর্মের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। বেদ দুটি কাণ্ডে বিভক্ত– জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম নিরাকার, অনন্ত, অনাদি ও চিরসত্য। তিনি আত্মারূপে সকল জীবের মধ্যে বিরাজমান। আর কর্মকাণ্ডে রয়েছে বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞের বর্ণনা ।

বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। যে জ্ঞানরাশি অবগত হলে মানুষের চতুর্বর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) লাভ ঘটে, তাই বেদ। শিষ্যগণ গুরুর কাছ থেকে শুনে শুনে বেদের মন্ত্রগুলো আয়ত্ত করত বলে বেদের এক নাম শ্রুতি। বেদ ঈশ্বরের বাণী। বিভিন্ন মুনি-ঋষি এই বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করে সংহত করেছেন। তাই বেদের অপর নাম সংহিতা। বেদ প্রথমে অখণ্ড ছিল। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বেদের মন্ত্রগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করেন। তাই তাঁর নাম হয় বেদব্যাস। চারটি বেদ হলো–ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। এই চারটি বেদের প্রত্যেকটি আবার চারটি অংশে বিভক্ত–সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ।

ঋগ্বেদ

ঋগ্বেদে দেবতাদের স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র রয়েছে। এগুলো পদ্যে রচিত। এই বেদে ১০৫৫২টি মন্ত্র রয়েছে। ঋগ্বেদে অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, উষা, রাত্রি প্রভৃতি দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি করা হয়েছে। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রটি হলো:

অগ্নিমীলে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্॥
(ঋগ্বেদ, ১/১)

সরলার্থ: অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক ও প্রভূতরত্নধারী; আমি অগ্নির স্তুতি করি।

সামবেদ

সাম মানে গান। যে মন্ত্র গান গাওয়া যায়, তাকেই সাম বলে । যজ্ঞ করার সময় দেবতাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রগুলো সুর দিয়ে গাওয়া হয়। সামমন্ত্রে গ্রন্থিত বেদ হচ্ছে সামবেদ। সামবেদে সর্বমোট ১৮০১টি মন্ত্র রয়েছে। সামবেদ পদ্যে রচিত।

যজুর্বেদ

যে মন্ত্রগুলো যজ্ঞের সময় উচ্চারণ করা হয়, সেগুলো যজুর্বেদ। যজুর্বেদের দুটি শাখা– শুক্লযজুর্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদ। যজুর্বেদে গদ্য ও পদ্য উভয় শ্রেণির মন্ত্র রয়েছে।

অথর্ববেদ

অথর্ববেদে চিকিৎসা বা ভেষজবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা (গৃহনির্মাণ), দৈনন্দিন আচার-অনুষ্ঠান, মাঙ্গালিক ক্রিয়াকাণ্ড ইত্যাদিসহ জীবনের নানা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এ বেদে প্রায় ৬০০০ মন্ত্র রয়েছে। অধিকাংশ মন্ত্রই পদ্যে রচিত।

উপনিষদ

উপনিষদ বেদের জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে পরিচিত। বেদের শেষে বা অন্তিমে অবস্থিত বলে এর অপর নাম বেদান্ত। যে বিদ্যা নিশ্চয়তার সঙ্গে গুরুর নিকটে বসে একনিষ্ঠভাবে অর্জন করা হয়, তাই উপনিষদ। উপনিষদের আলোচ্য বিষয় হলো ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম এক– এটাই উপনিষদের মূল কথা। উপনিষদে উল্লেখ আছে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে আছেন ব্রহ্ম। তিনি সত্য ও চৈতন্যময়। এছাড়া আর যা কিছু রয়েছে, সবই অসত্য ও জড়। সুতরাং ব্রহ্মকে লাভ করাই হচ্ছে জীবের একমাত্র লক্ষ্য।

ব্রহ্ম নিরাকার। তিনি আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। সুতরাং জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রহ্মজ্ঞানই হলো উপনিষদের বিষয়বস্তু। উপনিষদ সংখ্যায় অনেক। তবে ১২টি উপনিষদ প্রধান বলে স্বীকৃত। প্রধান উপনিষদগুলো হলো– ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক ও কৌষিতকী।

এখন আমরা ঈশ উপনিষদের প্রথম মন্ত্রটি জানব:

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্ ।। (১/১)

সরলার্থ: এই গতিশীল বিশ্বে যা কিছু চলমান বস্তু আছে, তা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত মনে করবে। ত্যাগের সঙ্গে ভোগ করবে, কারও ধনের প্রতি লোভ করবে না।

উপনিষদের মূল কথা নিচের ঘরে লেখ:

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

অনুশীলনী

ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. হিন্দুধর্ম -------- ধর্ম।
২. বেদ শব্দের অর্থ ------।
৩. আমি অগ্নির ------- করি।
৪. ব্রহ্ম ------।
৫. তিনি ------- ও চৈতন্যময়।

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. দেবতাদের স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র রয়েছে	যজুর্বেদে।
২. যজ্ঞের মন্ত্র আছে	গান।
৩. সাম অর্থ	অথর্ববেদে।
৪. ভেষজবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে	ঋগবেদে।
	জ্ঞান।

গ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ –

ক. বেদ　　খ. রামায়ণ
গ. পুরাণ　　ঘ. উপনিষদ

২. বেদ কার বাণী?

ক. দুর্গার　　খ. কালীর
গ. ঈশ্বরের　　ঘ. গণেশের

৩. ঋগবেদে কতটি মন্ত্র আছে?

ক. ১০৬৬২ টি　　খ. ১০৭৭৩ টি
গ. ১০৫৫২ টি　　ঘ. ১০৮৮২ টি

৪. ব্রহ্ম কী?

ক. সত্য　　খ. রাজা
গ. কাল্পনিক　　ঘ. কিংবদন্তি

৫. নিচের কোনটি উপনিষদ?

ক. পুরাণ　　খ. বেদ
গ. মুণ্ডক　　ঘ. সংহিতা

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. বেদ কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী?
২. যজুর্বেদ কাকে বলে?
৩. উপনিষদকে কেন বেদান্ত বলা হয়?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. ধর্মগ্রন্থ কাকে বলে? তোমার জানা কয়েকটি হিন্দুধর্মগ্রন্থের নাম লেখ।
২. সামবেদ সম্পর্কে লেখ।
৩. উপনিষদ বলতে কী বোঝায়? পাঁচটি উপনিষদের নাম লেখ।
৪. ব্রহ্ম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ

ঈশ্বর নিরাকার। তিনি যেকোনো রূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। ঈশ্বর যখন নিজের গুণ বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাকে দেব-দেবী বলে। সাধকেরাও ঈশ্বরের কোনো কোনো গুণকে সাকার রূপ দেন। দেব-দেবী ঈশ্বরের সাকার রূপ। দেব-দেবীর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘটে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, মনসা প্রভৃতি দেব-দেবী একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা শক্তি। এ কারণে হিন্দুধর্মাবলম্বীরা দেব-দেবীকে ঈশ্বররূপে পূজা করেন। আরাধনা করেন। পূজায় দেব-দেবী সন্তুষ্ট হন এবং পূজারীর অভীষ্ট পূরণ করেন।

ব্রহ্মা

ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু বিদ্যমান, সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন ব্রহ্মা। আকাশ, বাতাস, পাহাড়, পর্বত, নদী-নালা, মানুষ, জীব-জন্তু ইত্যাদি। তিনি বিষ্ণু ও শিবের সঙ্গে ত্রিমূর্তিতে বিরাজমান। বিষ্ণু হলেন রক্ষাকর্তা আর শিব হলেন সংহারকর্তা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তিনে এক, একে তিন। ব্রহ্মা সুন্দর ও স্বর্ণময় অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল। তাঁর চারটি মুখ ও চারটি বাহু রয়েছে। তিনি শ্মশ্রুমন্ডিত ও জটামুকুটধারী। তাঁর চার হাতে কোনো অস্ত্র নেই। তিনি জ্ঞানমুদ্রা ও সৃষ্টিমুদ্রা ধারণ করেন। তিনি এক হাতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদ, দ্বিতীয় হাতে জপমালা, তৃতীয় হাতে শ্বেতপদ্ম এবং চতুর্থ হাতে সৃষ্টির প্রতীক কমন্ডলু ধারণ করেন। তিনি পদ্মফুলের উপর অবস্থান করেন। রাজহংস তাঁর বাহন। লাল ফুল তাঁর প্রিয়। তাই লাল ফুল দিয়ে ব্রহ্মাকে পূজা করলে তিনি সন্তুষ্ট হন।

ব্রহ্মা দেবতা, দানব ও মানবের গুরু। ব্রহ্মা সৃষ্টি বিস্তারের লক্ষ্যে প্রথমে তাঁর মানসপুত্র ঋষিদের সৃষ্টি করেন। কিন্তু ঋষিগণ বংশ বিস্তারে অনীহা প্রকাশ করেন। তখন ব্রহ্মা নারী ও পুরুষের সৃষ্টি করেন। প্রথম সৃষ্ট পুরুষের নাম স্বয়ম্ভুব মনু আর নারীর নাম শতরূপা। মনুর সন্তান বলে আমরা মানব নামে পরিচিত।

ব্রহ্মাপূজা সাধারণত প্রতিদিন করা হয় না। তিথি-নক্ষত্র অনুসারে করা হয়। ভারতের রাজস্থানে পুষ্করের ব্রহ্মা মন্দির খুব প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মার প্রণাম মন্ত্র

নমোঽস্তু তে বিশ্বেশ্বর বিশ্বধাম জগৎসবিত্রে ভগবন্নমস্তে।
সপ্তার্চিলোকায় চ ভূতলেশ সর্বান্তরস্থায় নমো নমস্তে।।

সরলার্থ: হে ভগবান বিশ্বেশ্বর, বিশ্বধাম, জগতের সৃষ্টিকারী তোমাকে নমস্কার। হে পৃথিবীপতি, সপ্তজ্যোতির্লোকের আশ্রয়, সকলের অন্তরে অবস্থানকারী তোমাকে বারবার নমস্কার।

ব্রহ্মার প্রণাম মন্ত্রটি সরলার্থসহ সকলে মিলে আবৃত্তি করো:

বিষ্ণু

বিষ্ণু হিন্দুদের অন্যতম প্রধান দেবতা। ঈশ্বর বিষ্ণুরূপ ধারণ করে জগৎ প্রতিপালন ও রক্ষা করেন। তিনি আমাদের পালনকর্তা। তিনি ভক্তের নিকট নারায়ণ বা হরি নামেও পরিচিত। তিনি ঈশ্বরের পুরুষোত্তম সত্তা। বিষ্ণু শ্যামবর্ণ। তাঁর চার হাত। চার হাতে থাকে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম। উপরের বাম হাতে থাকে শঙ্খ, ডান হাতে চক্র। নিচের বাম হাতে গদা, ডান হাতে পদ্ম। বিষ্ণুর বাহন গরুড় পাখি। দেবী লক্ষ্মী তাঁর সহধর্মিণী।

বিষ্ণুপূজার নির্দিষ্ট কোনো তিথি নেই। যে-কোনো দিন বিষ্ণুপূজা করা যায়। তুলসীপাতা বিষ্ণুর খুব প্রিয়। এজন্য তুলসীপাতা ছাড়া বিষ্ণুপূজা হয় না। বিষ্ণুর উপাসকদের বলা হয় বৈষ্ণব।

বিষ্ণু নারায়ণ রূপেও পূজিত হন। তিনি সকল জীবের আশ্রয়স্থল। বিষ্ণুর পূজা করে আমরা পবিত্র হই। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হই। তাঁর পূজা করলে আমাদের মঙ্গল হয়। তাঁর কৃপায় পারিবারিক সুখ-শান্তি অর্জিত হয়।

বিষ্ণুর প্রণাম মন্ত্র

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

[সন্ধিবিচ্ছেদ: জগদ্ধিতায় = জগৎ + হিতায়]

সরলার্থ: ব্রহ্মণ্যদেব বিষ্ণুকে প্রণাম। গো, ব্রাহ্মণ এবং জগতের মঙ্গলকারী কৃষ্ণ ও গোবিন্দকে বারবার নমস্কার।

পূজা

পূজা অর্থ আরাধনা বা উপাসনা। ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে বিভিন্ন দেব-দেবীকে ফুল-ফল ও নানা উপকরণ দিয়ে স্তব-স্তুতি করা হলো পূজা। বৈদিকযুগে যজ্ঞের মাধ্যমে পূজা করা হতো। এরপর পৌরাণিক যুগে ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তির সাকার রূপ হিসেবে দেব-দেবীর পূজা করা হয়। দেব-দেবীর প্রশংসা বা শ্রদ্ধা করার জন্য ফুল, তুলসীপাতা, বেলপাতা, চন্দন প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। জল, ফল, মিষ্টি ইত্যাদি নৈবেদ্য সাজিয়ে তাঁদের নিবেদন করা হয়। এরপর ধূপ-দীপ জ্বেলে দেব-দেবীকে আরতি দেওয়া হয়। সবশেষে স্তব-স্তুতি, গুণকীর্তন করে তাঁদের প্রণাম করতে হয়। পারিবারিকভাবে প্রতিদিন পূজা করা হয়। আবার তিথিভেদে, মাস ও বছরের বিশেষ সময়ে মন্দিরে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন দেব-দেবীর ভিন্ন ভিন্ন পূজাপদ্ধতি ও মন্ত্র রয়েছে। পবিত্র চিত্তে ও একাগ্রভাবে পূজা করলে দেব-দেবী সন্তুষ্ট হন।

পার্বণ

সীমা মা-বাবার সাথে বসে গল্প করছিল। তাদের অনেক দিন কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না। এমন সময় ডাকপিয়ন এসে একটি কার্ড দিয়ে গেল। কার্ডটি ছিল শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আয়োজিত জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রার নিমন্ত্রণপত্র। সীমা খুব আগ্রহ নিয়ে কার্ডটি খুলে পড়ল। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শোভাযাত্রা বের হবে ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী শোভাযাত্রায় যাওয়ার ইচ্ছা তার অনেক দিনের। তাই মা-বাবার কাছে সীমা আবদার করল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করার। মন্দিরে আমরা পূজা-অর্চনার জন্য যাই। কিন্তু এবার জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারবে ভেবে সীমা অত্যন্ত খুশি হলো।

পার্বণ হলো উৎসব। উৎসব হলো আনন্দ অনুষ্ঠান। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবও পার্বণ। বিভিন্ন আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পার্বণ উদ্‌যাপন করা হয়। পার্বণগুলো হলো: জন্মাষ্টমী, নববর্ষ, পৌষসংক্রান্তি, চৈত্রসংক্রান্তি, নবান্ন ইত্যাদি। পূজা-পার্বণ উপলক্ষে সকলের সাথে ভাববিনিময় ও বিভিন্ন ধরনের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা হয়। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের জন্য ধর্মীয় আলোচনা সভা, প্রদীপ প্রজ্জ্বালন, গীতাযজ্ঞ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলার আয়োজন করা হয়। পূজা-পার্বণের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। একে অপরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য জাগ্রত হয়।

শুচিতা

শুচিতা একটি নৈতিক গুণ। ধর্মেরও অঙ্গ। শুচিতা মানে নির্মলতা বা পরিচ্ছন্নতা। প্রার্থনা, উপাসনা যেকোনো কাজের পূর্বশর্ত হচ্ছে শুচিতা। শরীর ও মনকে পূজা-অর্চনার উপযোগী করে তোলার জন্য শুচিতা অবশ্যই প্রয়োজন। শুচিতার মাধ্যমে শরীর ও মন পবিত্র হয়। শরীর ও মন ভালো থাকে। ফলে যেকোনো কাজে মনোযোগী হওয়া যায়।

শুচিতা প্রধানত দুই প্রকার– অভ্যন্তরীণ শুচিতা ও বাহ্যিক শুচিতা। অভ্যন্তরীণ শুচিতা হলো মনের পবিত্রতা। সব সময় সৎ চিন্তা করা, জ্ঞান লাভ করা, অপরকে হিংসা না করা, সকলের মঙ্গল কামনা করা প্রভৃতির মাধ্যমে মনের শুচিতা অর্জন করা যায়। তবেই মন পবিত্র ও সুস্থ হয়। প্রার্থনা ও উপাসনার জন্য মনের পবিত্রতা একান্ত প্রয়োজন। বাহ্যিক শুচিতা বলতে শারীরিক অর্থাৎ দেহ, পোশাক-পরিচ্ছদ, চারিদিকের পরিবেশ ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতাকে বোঝায়। মূলত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সকলের মঙ্গল হয়। তাই মনের শুচিতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছোটোবেলা থেকেই অন্তরের ও বাহ্যিক শুচিতার অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়। তবেই সমাজে সুন্দর পরিবেশ বজায় থাকে।

নিজেকে শুচি করার জন্য তুমি যে কাজ করবে লেখ:

অভ্যন্তরীণ শুচিতা	
বাহ্যিক শুচিতা	

অনুশীলনী

ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. ঈশ্বর -------।
২. ব্রহ্মা ------- দেবতা।
৩. উৎসব হলো ------- অনুষ্ঠান।
৪. শরীর ও মন ------- থাকে।
৫. বিষ্ণুর বাহন ---------।

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. দেব-দেবী ঈশ্বরের	পবিত্রতা।
২. লাল ফুল ব্রহ্মার	সন্তুষ্ট হন।
৩. পবিত্র চিত্তে পূজা করলে দেব-দেবী	সাকার রূপ।
৪. শুচিতা মানে নির্মলতা বা	তিথি নেই।
৫. বিষ্ণুপূজার নির্দিষ্ট কোনো	প্রিয়।
	প্রয়োজন।

গ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. দেব-দেবী ঈশ্বরের কেমন রূপ?

ক. নিরাকার　　খ. চৈতন্য
গ. সাকার　　ঘ. চিন্ময়

২. শ্বেতপদ্ম ব্রহ্মার কোন হাতে থাকে?

ক. দ্বিতীয় হাতে　　খ. প্রথম হাতে
গ. তৃতীয় হাতে　　ঘ. চতুর্থ হাতে

৩. পূজা অর্থ কী?

ক. আরাধনা করা　　খ. নিন্দা করা
গ. সম্মান করা　　ঘ. অসম্মান করা

৪. পার্বণ হলো –

ক.অঞ্জলি　　খ. মন্ত্রপাঠ
গ.পূজা　　ঘ. উৎসব

৫. শুচিতার মাধ্যমে শরীর ও মন –

ক. সুন্দর হয়　　খ. পবিত্র হয়
গ. অসুন্দর হয়　　ঘ. অপবিত্র হয়

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. দেব-দেবী কাকে বলে?
২. কখন ব্রহ্মার পূজা করা হয়?
৩. পূজা কাকে বলে?
৪. শুচিতা কত প্রকার ও কী কী?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. ব্রহ্মা সম্পর্কে তোমার ধারণা পাঁচটি বাক্যে লেখ।
২. কীভাবে পূজা করা হয়?
৩. পার্বণ বলতে কী বোঝায়? কয়েকটি পার্বণের নাম লেখ।
৪. শুচিতা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।
৫. বিষ্ণুর প্রণামমন্ত্রটি সরলার্থসহ লেখ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যোগব্যায়াম ও আসন

সৌম্যর কথা

সৌম্য চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। সে খুব মেধাবী। চঞ্চল প্রকৃতির। খাবার ও খেলাধুলার প্রতি তার আগ্রহ কম। অল্পেই রেগে যায়, পড়ালেখায় কিছুটা অমনোযোগী। মাঝে মাঝেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আদরের সন্তান সৌম্যকে নিয়ে ইদানীং দুশ্চিন্তায় আছেন মা-বাবা। এমন সময় সৌম্যর মামা ওদের বাসায় আসেন। সৌম্যর মা বিষয়টি তার ভাইকে জানান। সব শুনে সৌম্যর মামা কিছুটা ভাবলেন। তারপর সৌম্যকে বলেন, আগামীকাল আমরা ভোরে ঘুম থেকে উঠব। সৌম্য মামাকে খুব পছন্দ করে। প্রথমে ব্যাপারটা ভালো না লাগলেও মামার কথামতো ভোরে উঠল। মামা সৌম্যকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম করেন। কয়েক দিনের মধ্যে সৌম্যর পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। মা তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতি বুঝতে পারেন। মামা চলে যাওয়ার পরও সৌম্য ভোরে ঘুম থেকে উঠে ব্যায়ামের অভ্যাস অব্যাহত রাখল। সে আনন্দে খেলাধুলা, খাওয়া-দাওয়া, পড়ালেখা করতে লাগল।

মামা আসার পর সৌম্যর দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তনের কারণ বলো:

যুজ্ ধাতু থেকে যোগ শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ হলো যুক্ত করা। একের সঙ্গে অপরের মিলন বা তাদের একত্রিত করাকে বলা হয় যোগ। কিন্তু ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে যোগ বলতে বোঝায় ভগবানের সাথে মনঃসংযোগ। এজন্য প্রয়োজন শুদ্ধ, স্থির ও প্রশান্ত মন। আর মনের এরূপ দৃঢ় নিয়ন্ত্রণই হলো যোগ। এই যোগের আটটি অঙ্গ– যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

যোগের একটি অঙ্গ আসন। আসন অর্থ স্থির হয়ে বসা। যেভাবে শরীরকে রাখলে শরীর দৃঢ় ও স্থির থাকে অথচ কোনো কষ্ট অনুভূত হয় না, তাকে যোগাসন বলে। যোগাসন অনুশীলনের কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। সেগুলো অনুসরণ করতে হয়। তবেই এর উপকার পাওয়া যায়। নিয়মিত যোগব্যায়াম করলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। কোনো রোগ-ব্যাধি সহজে আক্রমণ করতে পারে না। সেজন্য নিয়মিত যোগব্যায়াম করা উচিত। প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিগণ যোগসাধনার দ্বারাই শরীরকে সুস্থ সবল রাখতেন। ধ্যান-জপ-তপ ও প্রাণায়ামে নিজেদের নীরোগ রাখতেন। আসন অনেক প্রকার। যেমন– পদ্মাসন, শবাসন, সিদ্ধাসন, সর্বাঙ্গাসন, শলভাসন, গোমুখাসন ইত্যাদি।

পদ্মাসন

পদ্মাসন দেখতে পদ্মের মতো। তাই এর নাম পদ্মাসন। নারী ও পুরুষ উভয়েই এ আসন করতে পারেন।

পদ্মাসনের নিয়ম

কোনো সমতল স্থানে দুই পা সামনে ছড়িয়ে বসতে হয়। তারপর ডান পা হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে বাম জানুর উপর রাখতে হয়। আবার বাম পা ভেঙে ডান জানুর উপর রাখতে হয়। দুই পায়ের গোড়ালি তলপেটের সঙ্গে মিশে থাকবে। বসার জায়গার সঙ্গে দুই হাঁটুও মিশে থাকবে। হাঁটু যেন উঁচু না থাকে। সোজা হয়ে বসতে হয়। মাথা, ঘাড় এবং মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। এক মিনিট বসে থাকার পর পা ছড়িয়ে দিতে হয়। এরপর আবার পা পরিবর্তন করে বসতে হয়। অর্থাৎ বাম পা ডান জানুর উপর রাখতে হয়। শুরুতে এক থেকে দুই মিনিট এবং পরে একটু একটু করে সময় বাড়াতে হয়। আসন শেষে বাম পা প্রথমে তুলতে হয় এবং পরে ডান পা তুলতে হয়।

উপকারিতা

নিয়মিত এ আসন করলে অনিদ্রা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শরীরের মেদ কমে। মনের একাগ্রতা অর্থাৎ মনঃসংযোগ বাড়ে। এই আসনে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীদের জন্য পদ্মাসন খুবই উপকারী।

শবাসন

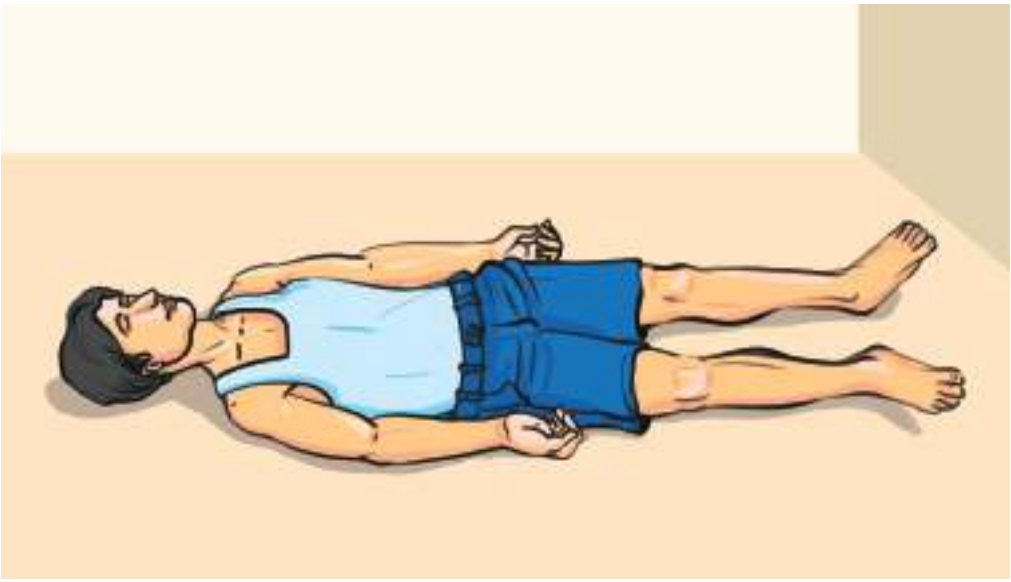

এই আসনটিতে শবের মতো অর্থাৎ লাশের মতো শুয়ে থাকতে হয় বলে এর নাম শবাসন।

শবাসনের নিয়ম

কোনো শক্ত জায়গায় চিৎ হয়ে শুয়ে পা দুটি লম্বা করে ছড়িয়ে দিতে হয়। পা দুটির মাঝে প্রায় এক ফুটের মতো ফাঁকা থাকবে। পায়ের গোড়ালি ভিতরের দিকে থাকবে। আঙুলগুলো থাকবে বাইরের দিকে। হাত দুটি লম্বালম্বিভাবে শরীরের দুপাশে উরু থেকে কাছাকাছি রাখতে হবে। হাতের পাতা আধমুঠো অবস্থায় থাকবে। কোনো শক্তভাব যেন না থাকে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করতে হবে। এই আসনটি একসঙ্গে দশ থেকে পনেরো মিনিট পর্যন্ত অনুশীলন করতে হয়। আধা ঘণ্টা হলে আরও ভালো। তবে অন্য কোনো আসনের পর এই আসন অন্তত পাঁচ থেকে দশ মিনিট পর্যন্ত করা উচিত।

উপকারিতা

নিয়মিত শবাসন করলে শরীরের ক্লান্তি দূর হয়। শরীরে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে। শবাসন মনকে শান্ত করে। উদ্বেগ ও মানসিক চাপ কমায়।

সর্বাঙ্গাসন

যে আসন অভ্যাস করলে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ, সবল ও নীরোগ হয়, তাকে সর্বাঙ্গাসন বলে। এ আসনে মাত্র বিশ বা ত্রিশ সেকেন্ডের মতো থাকতে হয়।

সর্বাঙ্গাসনের নিয়ম

প্রথমে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হয়। পা দুটি সোজা করে ধীরে ধীরে উপরে তুলতে হয়। তারপর হাত দুটি পাঁজরের দুপাশে মাটিতে রাখতে হয়। তখন হাতের উপর ভর দিয়ে পা দুটি জোড়া ও সোজা অবস্থায় যতদূর সম্ভব উপরে তুলতে হয়। এবার হাত দুটি কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙে কোমরের দুপাশে ধরতে হয় এবং কনুইয়ের উপরে জোর দিয়ে কোমর ও পা সোজা অবস্থায় উপরে তুলতে হয়। এ অবস্থায় চিবুকটি যেন বুক ও কণ্ঠনালির মধ্যে লেগে থাকে। এভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে বিশ থেকে ত্রিশ সেকেন্ড থাকতে হয়। এরপর কনুইয়ের উপর জোর রেখে আস্তে আস্তে পা নামাতে হয় এবং প্রয়োজন মতো শবাসনে বিশ্রাম নিতে হয়। এই আসনটি তিন হতে চার বার অভ্যাস করতে হয়।

উপকারিতা

এ আসন অনুশীলন করলে সকল প্রকার রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। নিয়মিত এ আসন করলে থাইরয়েড, টনসিল, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতি গ্রন্থি সতেজ ও সক্রিয় থাকে। এছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্যও দূর হয়।

এবার আমরা ব্যায়াম তিনটি অনুশীলন করব।

অনুশীলনী

ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. যুজ্ ধাতু থেকে ------- শব্দের উৎপত্তি।
২. যোগের একটি অঙ্গ ------।
৩. আসন অর্থ ------ হয়ে বসা।
৪. পদ্মাসন দেখতে ------- মতো।
৫. নিয়মিত শবাসন করলে শরীরের ------ দূর হয়।

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. নিয়মিত যোগব্যায়াম	মুক্তি।
২. পদ্মাসনে জীবনীশক্তি	বৃদ্ধি পায়।
৩. শবাসনে রক্ত সঞ্চালন	করা উচিত।
৪. শিক্ষার্থীদের জন্য পদ্মাসন	স্বাভাবিক থাকে।
	খুবই উপকারী।

গ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. যোগের কতটি অঙ্গ?

ক. ছয়টি　　খ. নয়টি
গ. সাতটি　　ঘ. আটটি

২. কোন আসনে অনিদ্রা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

ক. পদ্মাসন　　খ. শবাসন
গ. সর্বাঙ্গাসন　　ঘ. সুখাসন

৩. শবাসন মনকে কী করে?

ক. শান্ত　　খ. চঞ্চল
গ. উদ্বিগ্ন　　ঘ. ক্লান্ত

৪. সর্বাঙ্গাসন কত বার অভ্যাস করতে হয়?

ক. দুই হতে তিন বার　　খ. তিন হতে চার বার
গ. পাঁচ হতে ছয় বার　　ঘ. চার হতে পাঁচ বার

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. পাঁচটি আসনের নাম লেখ।
২. পদ্মাসন বলতে কী বোঝায়?
৩. শবাসনের তিনটি উপকারিতা লেখ।
৪. নিয়মিত যোগব্যায়াম করা উচিত কেন?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. যোগ বলতে কী বোঝায়? যোগের কয়টি অঙ্গ ও কী কী?
২. পদ্মাসনের ধাপগুলো লেখ।
৩. সর্বাঙ্গাসনের উপকারিতা বর্ণনা করো।
৪. শরীর সুস্থ রাখতে করণীয় সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

মন্দির

মন্দির হলো দেবালয়। মন্দিরে দেব-দেবীর প্রতিমা থাকে। এখানে দেব-দেবীর আরাধনা করা হয়ে থাকে। প্রতিদিন মন্দিরে দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করা হয়। মন্দির পবিত্র স্থান। মন্দিরে গেলে দেহ-মন পবিত্র হয়। মনে শান্তি আসে। মন্দিরে অলংকার ও বাদ্যযন্ত্রে ভূষিত দেব-দেবীর মূর্তি দেখে ভক্তরা মুগ্ধ হন। ভক্তিতে মাথা নত করেন। নিজের মনের বাসনা পূরণ ও সকলের শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন। সাধারণত দেব-দেবীর নাম অনুসারে মন্দিরের নামকরণ করা হয়। যেমন– শিবমন্দির, কালীমন্দির, দুর্গামন্দির, রাধা-কৃষ্ণমন্দির ইত্যাদি।

ঢাকেশ্বরী মন্দির

ঢাকেশ্বরী মন্দির ঢাকায় অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের জাতীয় মন্দির। ঢাকার আদি ও প্রথম মন্দির। ঢাকেশ্বরী শব্দের অর্থ ঢাকার ঈশ্বরী। অনেকে মনে করেন, ঢাকা নামের উৎপত্তি এই ঢাকেশ্বরী নাম থেকেই। দ্বাদশ শতকে সেন রাজবংশের রাজা বল্লাল সেন এ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের বিগ্রহটি কাত্যায়নী মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজা দেবী দুর্গার। দেবীর দুই পাশে রয়েছেন লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং নিচের দুই পাশে কার্তিক ও গণেশ। বাহনরূপে পশুরাজ সিংহ, যার উপর দাঁড়িয়ে দেবী মহিষাসুরকে বধ করছেন। দেবীর বিগ্রহের উচ্চতা আনুমানিক দেড় ফুট।

ঢাকেশ্বরী মন্দিরে দশভুজা দেবী দুর্গার পাশে একটি বাসুদেব বিগ্রহ, শিবমূর্তি ও সন্তোষী মাতার মূর্তি রয়েছে। মন্দিরের ডান পাশে স্থাপিত হয়েছে একটি শিবলিঙ্গ। মন্দিরে প্রবেশের জন্য রয়েছে একটি সিংহদ্বার। মন্দিরের সামনে রয়েছে একটি সুন্দর নাটমন্দির। নাটমন্দিরের পাশে রয়েছে একটি পাঁচতলা ভবন। এখানে মন্দিরের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি পুকুর আছে। পুকুরের উত্তর-পূর্ব কোণে একই সারিতে একই আয়তনের চারটি শিবমন্দিরে চারটি শিবলিঙ্গ রয়েছে। মন্দিরের ভবনগুলো হলুদ ও লাল রঙের। ঢাকেশ্বরী মেলাঙ্গনের সামনে মহানগর সার্বজনীন পূজামণ্ডপ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিবছর এখানে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এর পাশে একটি সুউচ্চ অতিথিশালা নির্মিত হয়েছে।

প্রতিবছর ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা, দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজাসহ বিভিন্ন প্রকার পূজার আয়োজন করা হয়। দেশ-বিদেশের ভক্তবৃন্দ ও দর্শনার্থী মন্দির প্রাঙ্গণে এসে পূজা-অর্চনায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া মন্দির প্রাঙ্গণে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উপরের বর্ণনা অনুযায়ী ঢাকেশ্বরী মন্দিরে যা যা দেখতে পেয়েছো তার একটি তালিকা তৈরি করো:

তীর্থক্ষেত্র

কুশলের ঠাকুরমা-ঠাকুরদার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণ করার। বয়স হয়েছে তাঁদের। সঙ্গে কেউ না থাকলে কোথাও যেতে পারেন না। বাড়ির কাছেই কালীমন্দির অবস্থিত। মন্দির কর্তৃপক্ষ বয়স্কদের নিয়ে প্রতিবছর তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণের আয়োজন করে থাকে। কুশলের বাবা তাঁদের সাথে যোগাযোগ করে তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণের জন্য টাকা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিলেন। তীর্থভ্রমণ হবে তিনদিন ব্যাপী। প্রথমেই তাঁরা যাবেন চন্দ্রনাথধামে। কুশল আগ্রহ নিয়ে বসে আছে ঠাকুরমা ঠাকুরদার নিকট থেকে তীর্থভ্রমণের গল্প শোনার জন্য। তাঁরা তীর্থ থেকে ফিরে এলে কুশল প্রথমেই তাঁদের প্রণাম করল এবং তীর্থভ্রমণের গল্প বলতে বলল। একটু বিশ্রাম নিয়ে তাঁরা দুজনে মিলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তীর্থভ্রমণের বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। সাথে কিছু ছবিও দেখালেন। কুশল ছবি দেখে ও বর্ণনা শুনে খুব খুশি। সে কয়েকটি ছবি নিল বন্ধুদের দেখানোর জন্য। কুশল বন্ধুদের ছবি দেখিয়ে ঠাকুরদা-ঠাকুরমার তীর্থভ্রমণের গল্প শোনাল। কুশলের গল্প শুনে বন্ধুদেরও তীর্থভ্রমণের প্রতি আগ্রহ তৈরি হলো। তারাও একসাথে তীর্থভ্রমণ করবে বলে ঠিক করল।

তীর্থক্ষেত্র হলো পবিত্র স্থান। দেব-দেবী, অবতার কিংবা মহাপুরুষ বা মহীয়সী নারীর স্মৃতিবিজড়িত স্থানই তীর্থক্ষেত্র। ভক্তবৃন্দ ও দর্শনার্থীরা তীর্থক্ষেত্রে যান। তীর্থক্ষেত্রে গেলে মন পবিত্র হয়। পুণ্যলাভ হয়। নতুন নতুন জায়গা দেখা হয়। অনেক অজানা বিষয় জানা যায়। মনে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ থাকে না। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী তীর্থক্ষেত্রে বসবাস করেন। পূজা-অর্চনা করেন। সাধন-ভজন করেন। বাংলাদেশ ও ভারতে অনেক তীর্থক্ষেত্র রয়েছে। যেমন– বাংলাদেশে রয়েছে চন্দ্রনাথধাম, লাঙ্গালবন্দ, ওড়াকান্দি প্রভৃতি। ভারতে রয়েছে মথুরা, নবদ্বীপ, মায়াপুর, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ভক্ত ও দর্শনার্থীরা এসব তীর্থক্ষেত্রে তীর্থভ্রমণে আসেন। তীর্থক্ষেত্রে এসে তাঁরা হিন্দুধর্ম ও দেশের সংস্কৃতির সাথেও পরিচিত হন। এখন আমরা দুটি তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে জানব।

চন্দ্রনাথধাম

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম জেলায় অনেক পাহাড় রয়েছে। তার মধ্যে চন্দ্রনাথ পাহাড় অন্যতম। এটি সীতাকুন্ড উপজেলায় অবস্থিত। এর উচ্চতা ৩১০ মিটার। এই চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর একটি শিবমন্দির রয়েছে। এরই নাম চন্দ্রনাথধাম বা চন্দ্রনাথমন্দির। এটি বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। শিবের এক নাম চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথমন্দিরে প্রতিদিন পূজা হয়। এছাড়া ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথির রাতে চন্দ্রনাথধামে শিবের আরাধনা করা হয়। এই তিথি শিবচতুর্দশী নামে পরিচিত। এই শিবচতুর্দশী তিথিতে চন্দ্রনাথধামে দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত আসেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও মেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলার নাম শিবচতুর্দশী মেলা। সকল ধর্মের মানুষ এই মেলায় অংশগ্রহণ করেন। শিবচতুর্দশী মেলায় গেলে মন শান্ত ও পবিত্র হয়।

বাংলাদেশের একটি পবিত্র স্থান হলো এই চন্দ্রনাথধাম। এটি দর্শনীয় স্থানও বটে। তাই আমাদের উচিত এই মন্দিরটি রক্ষা করা। এর ঐতিহ্য বিশ্বের কাছে তুলে ধরা।

তীর্থভ্রমণে কী কী ফল লাভ হয় লেখ:

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্থান

পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে ধর্মীয় স্থান হলো পবিত্র। আমাদের দেশে চারটি প্রধান ধর্ম রয়েছে। প্রতিটি ধর্মেরই নিজস্ব একাধিক ধর্মীয় স্থান রয়েছে।

ইসলাম ধর্মের পবিত্র স্থান	সৌদি আরবে অবস্থিত মক্কার কাবা শরিফ পবিত্রতম স্থান। এরপর মদিনার মসজিদে নববি ও জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদ। বাংলাদেশে রয়েছে বায়তুল মোকাররম মসজিদ, ষাট গম্বুজ মসজিদ প্রভৃতি।
বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র স্থান	বৌদ্ধধর্মে চারটি প্রধান তীর্থ স্থান রয়েছে- লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ ও কুশিনগর। বাংলাদেশে রয়েছে রাংকূট বিহার, রামু বৌদ্ধবিহার, ধর্মরাজিক বৌদ্ধবিহার, প্রভৃতি।
খ্রিষ্ট ধর্মের পবিত্র স্থান	খ্রিষ্টানদের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মস্থান সেপুলচারের চার্চ, বেথলেহেম চার্চ। বাংলাদেশে রয়েছে পবিত্র জপমালা রানির গির্জা, তেজগাঁও, ঢাকা। সাধু নিকোলাসের গির্জা, কালীগঞ্জ প্রভৃতি।

প্রতিটি ধর্মের একটি করে ধর্মীয় স্থানের নাম লেখ:

ইসলামধর্মের পবিত্র স্থান	বৌদ্ধধর্মের পবিত্র স্থান	খ্রিষ্টধর্মের পবিত্র স্থান

অনুশীলনী

ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. মন্দির হলো --------।
২. ঢাকেশ্বরী শব্দের অর্থ ঢাকার --------।
৩. তীর্থক্ষেত্রে গেলে মন-------- হয়।
৪. চন্দ্রনাথধামে অনুষ্ঠিত মেলার নাম --------- মেলা।
৫. চারটি শিব মন্দিরে চারটি ---------রয়েছে।

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. মন্দিরে গেলে দেহমন	পবিত্র স্থান।
২. প্রতিবছর এখানে	পবিত্র হয়
৩. তীর্থক্ষেত্র হলো	দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।
৪. মন্দির প্রাঙ্গণে একটি	পুকুর আছে।
	গড়ে ওঠে।

গ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. বাংলাদেশের জাতীয় মন্দিরের নাম কী?

ক. কান্তজিউ মন্দির　　খ. ঢাকেশ্বরী মন্দির
গ. রমনা কালী মন্দির　　ঘ. শিব মন্দির

২. ঢাকেশ্বরী মন্দির কে প্রতিষ্ঠা করেন?

ক. রাজা বল্লাল সেন　　খ. সম্রাট অশোক
গ. রাজা বিক্রমাদিত্য　　ঘ. রাজা সমুদ্রগুপ্ত

৩. লাঙ্গলবন্দ অবস্থিত –

ক. বাংলাদেশে　　খ. ভারতে
গ. নেপালে　　ঘ. শ্রীলঙ্কায়

৪. শিবের এক নাম –

ক. চন্দ্রনাথ　　খ. মাধব
গ. জগন্নাথ　　ঘ. নারায়ণ

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. মন্দিরে কী করা হয়?
২. ঢাকেশ্বরী মন্দিরে কোন দেবীর বিগ্রহ রয়েছে?
৩. চন্দ্রনাথধাম সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. মন্দির বলতে কী বোঝায়? কয়েকটি মন্দিরের নাম লেখ।
২. ঢাকেশ্বরী মন্দির সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।
৩. বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রের বর্ণনা দাও।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

খালি ঘরে সঠিক শব্দটি বসাও:

বুদ্ধপূর্ণিমা	বড়দিন	দুর্গাপূজা	ঈদুল ফিতর

	হিন্দুধর্ম	ইসলামধর্ম	
	বৌদ্ধধর্ম	খ্রিষ্টধর্ম	

আমরা মানুষ। মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে। জগৎ-জীবন সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা আছে। আমার যেমন নিজস্ব মতামত আছে, তেমনি অন্যেরও নিজস্ব মতামত আছে। কিন্তু সাধারণত আমরা আমাদের নিজ নিজ মতকেই বড়ো করে দেখি। অন্যের মতের গুরুত্ব দিই না। অন্যের মত উপেক্ষা করি। এর ফলে আমাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। কিন্তু আমরা যদি অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই, তাহলে কোনো বিরোধ থাকে না। সকলের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

হিন্দুধর্মের মতো অন্যান্য ধর্মের মানুষও ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদ। তারা বছরে দুটি ঈদ উদ্‌যাপন করে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বুদ্ধপূর্ণিমা। গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষে এই উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। মাঘীপূর্ণিমাও বৌদ্ধদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিন। প্রতিবছর ২৫ ডিসেম্বর যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিনটি বড়দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। এছাড়া তারা গুড ফ্রাইডে পালন ও ইস্টার সানডে উদ্‌যাপন করে। এসব উৎসবে সবাই মিলে অংশগ্রহণ করি।

পৃথিবীতে অনেক মত, অনেক পথ আছে। ধর্মপালনের ক্ষেত্রেও নানা মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে। সকল মত ও পথকে, সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সম্প্রীতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, “যত মত, তত পথ।” স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।” হরিচাঁদ

ঠাকুর বলেছেন, “সকল ধর্মের প্রতি উদার থাকবে।” সারদা দেবী বলেছেন, “যদি শান্তি চাও, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগতকে আপন করে নিতে শেখো। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।” বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদগীতাসহ প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের বাণী প্রচারিত হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ। এ সম্প্রীতি আমাদের দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য। বাংলাদেশ জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের নিরাপদ আবাসভূমি। বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্ট ধর্মের মানুষ রয়েছে। অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে সকল ধর্মের মানুষ একসাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে। এ দেশের মানুষ নিজ ধর্ম ও অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। প্রতিটি ধর্মের মানুষ তাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড স্বতন্ত্রভাবে পালন করলেও ধর্মীয় উৎসবে সকল ধর্মের মানুষ অংশগ্রহণ করে। সকলের মঙ্গল কামনা করে। একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানায়, খাওয়া-দাওয়া করে। কোনো ধর্মই হিংসার কথা বলে না, বিভেদের কথা বলে

না; বলে ঐক্য ও শান্তির কথা। মানবতাই ধর্মের শাশ্বত বাণী। ধর্ম মানুষকে ন্যায় ও কল্যাণের পথে আহ্বান করে। অন্যায় ও অসত্য থেকে দূরে রাখে। মানবতার পথ দেখায়। সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এই চেতনাকে ধারণ করতে হবে। সকলে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করতে হবে।

অনুশীলনী

ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. জগৎকে ------- করে নিতে শেখো।
২. মাঘীপূর্ণিমাও -------- একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব।
৩. মানবতাই ধর্মের ------- বাণী।
৪. 'যত মত, ---------'।

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. সকলের মধ্যে সুসম্পর্ক	বলে না।
২. এই চেতনাকে	গড়ে ওঠে।
৩. কোনো ধর্মই হিংসার কথা	দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য।
৪. সম্প্রীতি আমাদের	পবিত্র স্থান।
	ধারণ করতে হবে।

গ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বছরে কতটি ঈদ উদযাপন করে?

ক. চারটি　　খ. তিনটি
গ. দুটি　　ঘ. একটি

২. 'যত মত, তত পথ'– কথাটি কে বলেছেন?

ক. স্বামী বিবেকানন্দ　　খ. শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
গ. হরিচাঁদ ঠাকুর　　ঘ. মা সারদা দেবী

৩. খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কী?

ক. বড়দিন খ. পাম সানডে
গ. ইস্টার সানডে ঘ. গুড ফ্রাইডে

৪. হরিচাঁদ ঠাকুর সকল ধর্মের প্রতি কেমন থাকতে বলেছেন?

ক. রক্ষণশীল খ. উদার
গ. অনুদার ঘ. সহনশীল

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কী?
২. কত তারিখ বড়দিন পালন করা হয় এবং কেন?
৩. বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে লেখ।
৪. কীভাবে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়?
৫. সারদাদেবীর একটি বাণী লেখ।

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. কীভাবে সকলের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা যায়?
২. মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব পাঁচটি বাক্যে লেখ।
৩. খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে লেখ।
৪. সম্প্রীতি সম্পর্কে হিন্দুধর্মের তিনজন মহামানবের বাণী লেখ।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবসেবা ও দেশপ্রেম

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগৎ

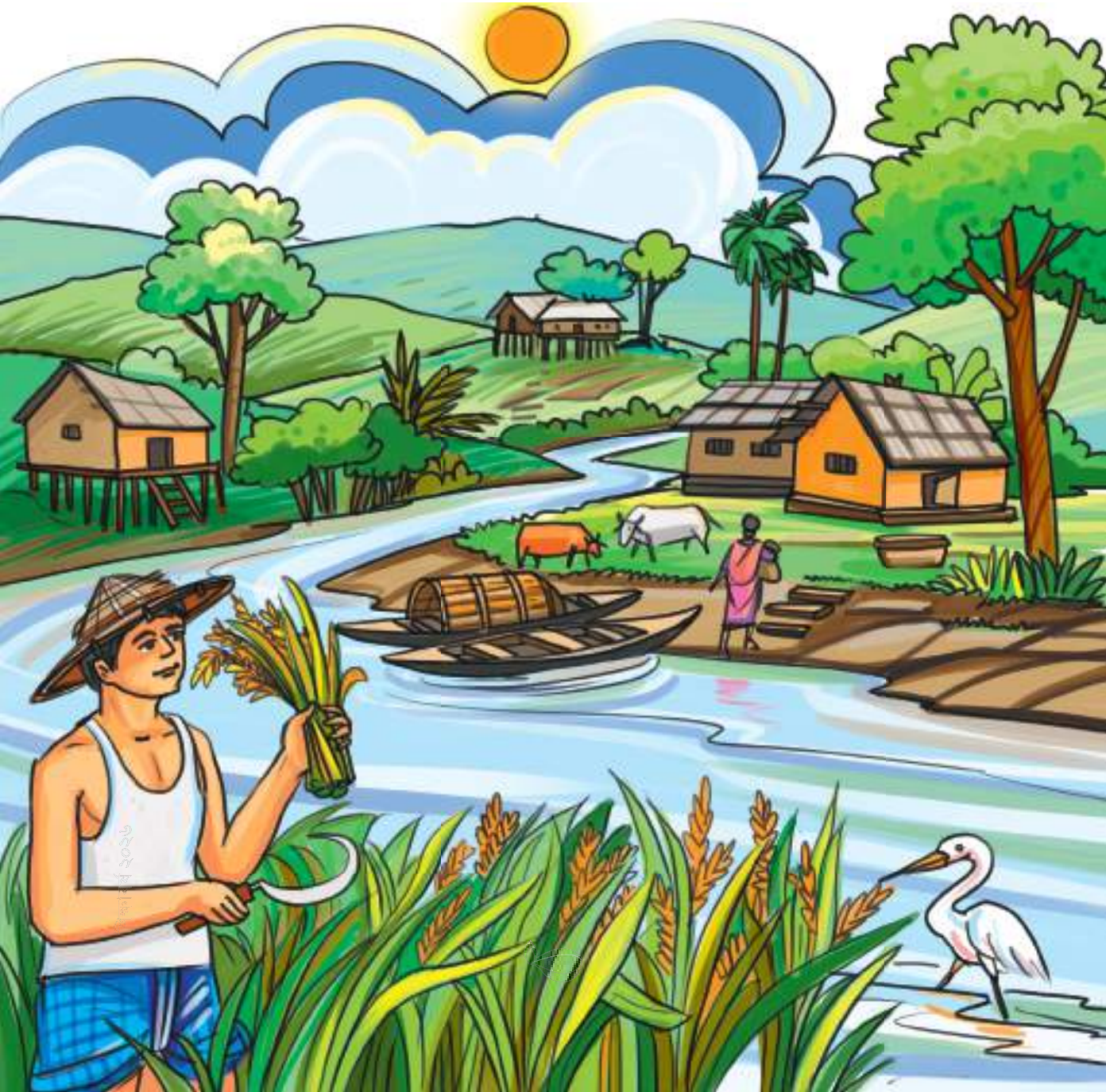

ছবির যেকোনো চারটি উপাদান তোমার জীবনে কীভাবে কাজে লাগে লেখ:

উপাদানের নাম	কীভাবে কাজে লাগে

প্রকৃতি ও জীবজগতের রূপ আমাদের মুগ্ধ করে। প্রকৃতির সবকিছুর সাথে মিলেমিশে আছে মানুষের জীবন। সত্যি কত বৈচিত্র্যময়, কত সুন্দর ঈশ্বরের সৃষ্ট এই জগৎ। আমাদের চারপাশে রয়েছে প্রকৃতির অসংখ্য উপাদান। এগুলোর মধ্যে অনেকের জীবন আছে। যেমন: গাছপালা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি। খালি চোখে দেখা যায় না এমন অতি ক্ষুদ্র জীবও আছে। মানুষসহ সকল জীব নিয়ে গঠিত জগৎ হলো জীবজগৎ।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। পৃথিবীজুড়ে মানুষে মানুষে রয়েছে কত না বৈচিত্র্য। গায়ের রং, আকার-আকৃতি, কণ্ঠস্বর, চিন্তা-ভাবনায় একজন মানুষ আরেকজন থেকে আলাদা। মানুষের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আমাদের অবাক করে। মানুষ একা বাস করতে পারে না। মানুষ পরিবার ও প্রতিবেশীদের নিয়ে বসবাস করে। পথ চলতে চলতে সম্পর্ক হয় দেশ ও দেশের বাইরের বিভিন্ন মানুষের সাথে। আমরা একে অন্যের সহযোগিতা নিয়ে জীবনযাপন করি। সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করি। আনন্দ-উৎসবে একসাথে মিলিত হই। আর এভাবে একজন মানুষের সাথে অন্য মানুষের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আমরা মানুষ। আমরা একে অপরকে ভালোবাসব। কেউ কাউকে হিংসা করব না, ঘৃণা করব না। কারো ক্ষতি হয় এমন কাজ করব না। অন্যের বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব। গরিব-দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াব। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল থাকব।

পৃথিবীতে অনেক বস্তু রয়েছে যেগুলোর জীবন নেই। যেমন– আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, মাটি, খাল-বিল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি। সবকিছুই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরের সকল সৃষ্টি নিয়েই প্রকৃতি।

প্রকৃতির অংশ এমন একটি জড়বস্তুর ছবি আঁকো:

মনে করো, তোমার বসবাসের জায়গার আশেপাশে বন ছিল। সেই বনে ছিল অসংখ্য গাছপালা। ছিল হরেক রকমের পশু-পাখি। সেই বন থেকে মানুষের অনেক প্রয়োজন মিটত। বনের সৌন্দর্য সবাইকে আনন্দ দিত। একসময় সেই বন ধ্বংস করে গড়ে উঠল ঘর-বাড়ি, শিল্প-কারখানা।

এই বন ধ্বংস করে ফেলায় তোমার অনুভূতি লেখ:

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

প্রতিটি জীব কোনো না কোনোভাবে আমাদের উপকারে আসে। আমরা মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাকসবজি, ফল-মূল ইত্যাদি পাই কোনো না কোনো জীব থেকে। প্রকৃতি থেকে কোনো জীব বিলুপ্ত হলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাই অকারণে জীবহত্যা করা উচিত নয়।

মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির উপাদান মাটি, জল, বায়ু, আলো ইত্যাদি ছাড়া কোনো জীবই বাঁচতে পারে না। প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সম্পর্ক।

প্রকৃতি ভালো থাকলে আমরাও ভালো থাকব। আমরা সবাই প্রকৃতি ও জীবজগৎকে ভালোবাসব এবং সংরক্ষণে যত্নশীল হব। তাই আমাদের উচিত ঈশ্বরের সকল সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করা।

কীভাবে প্রকৃতির যত্ন নেওয়া যায় তা সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে গাছটি পূর্ণ করো:

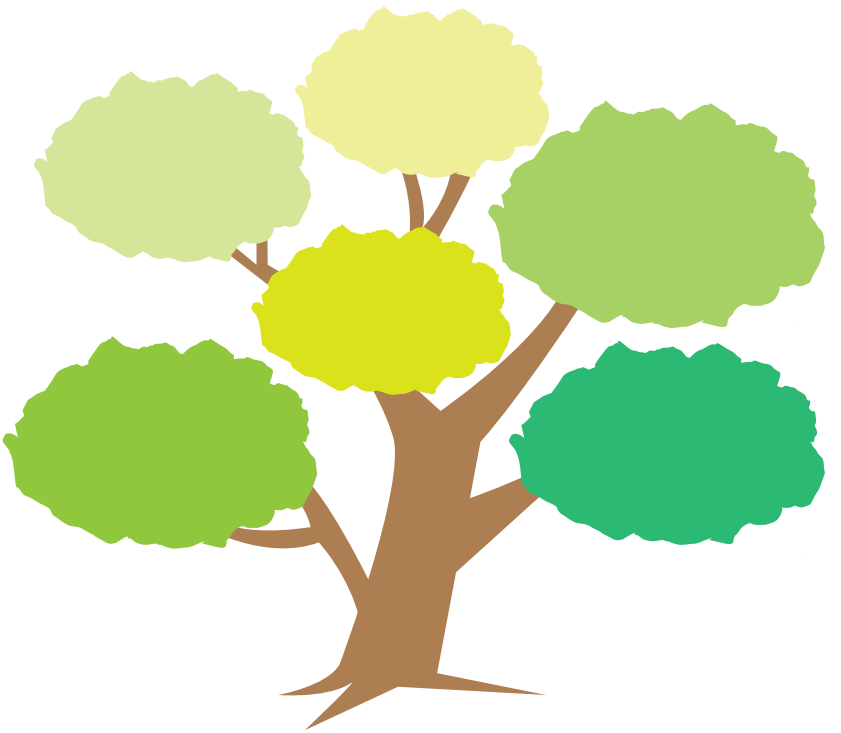

অনুশীলনী

ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. মানুষ সৃষ্টির -------- জীব।
২. মানুষ পরিবার ও ---------- নিয়ে বসবাস করে।
৩. আমরা একে অপরকে ----------।
৪. বনের ---------- সবাইকে আনন্দ দিত।

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. প্রকৃতি ও জীবজগতের রূপ	আমাদের মুগ্ধ করে।
২. প্রকৃতির সবকিছুর সাথে মিলেমিশে আছে	পাশে দাঁড়াবো।
৩. পৃথিবীতে অনেক বস্তু রয়েছে	আমরাও ভালো থাকব।
৪. প্রকৃতি ভালো থাকলে	ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন।
৫. গরিব দুঃখী মানুষের	মানুষের জীবন।
	যেগুলোর জীবন নেই।

গ) সঠিক শব্দটির উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. মানুষসহ সকল জীব নিয়ে গঠিত জগৎ হলো –

ক) জীবজগৎ　　খ) জড়জগৎ
গ) সৌরজগৎ　　ঘ) বিশ্বজগৎ

২. আমরা একে অন্যের সহযোগিতা নিয়ে –

ক) আনন্দ করি　　খ) হাটাহাটি করি
গ) জীবনযাপন করি　　ঘ) পথ চলি

৩. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি –

ক) বৈষম্য দেখাবো　　খ) সহানুভূতিশীল থাকব
গ) অসহযোগিতা করব　　ঘ) বিরূপ আচরণ করব

৪. ঈশ্বরের সকল সৃষ্টি নিয়েই –

ক) প্রকৃতি　　খ) প্রাণিজগৎ
গ) জড়জগৎ　　ঘ) উদ্ভিদজগৎ

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. মানুষের জীবন কীসের সাথে মিলেমিশে আছে?
২. আমরা একে অন্যের বিপদে কী করব?
৩. জীবের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক উপাদানগুলো লেখ।
৪. কী ভালো থাকলে আমরাও ভালো থাকব?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. "মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল"– ব্যাখ্যা করো।
২. একটি প্রাকৃতিক বনভূমি কীভাবে সংরক্ষণ করা যায়?
৩. মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক কীভাবে গড়ে ওঠে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবসেবা

মানুষ, প্রকৃতি ও জীবের সেবা করার উপায় লেখ:

বিষয়	সেবা করার উপায়
মানুষ	
প্রকৃতি	
জীবজগৎ	

সেবা অর্থ যত্ন, পরিচর্যা ইত্যাদি। হিন্দুধর্মে সেবা শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবের মঙ্গলের জন্য যে সেবা তথা কাজ করা হয়, তাই জীবসেবা। আমরা বিভিন্নভাবে জীবের সেবা করতে পারি। অসুস্থকে শুশ্রূষা করা, বয়স্ক ব্যক্তিকে কাজে সাহায্য করা, ক্ষুধার্তকে খেতে দেওয়া ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে জীবসেবা করা যায়। বাড়িতে অতিথি এলে ভালো ব্যবহার করা, তার যত্ন করা, অন্যের বিপদে সহযোগিতা করা, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দেওয়া হলো জীবসেবা। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের যত্ন নেওয়া, গাছপালার পরিচর্যা করা, পশু-পাখির যত্ন নেওয়া— এসবই জীবসেবা। জীবসেবা একটি নৈতিক ও মানবিক গুণ। জীবসেবা ধর্মের অঙ্গ।

মানুষ হিসেবে একে অপরকে ভালোবাসা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। প্রভু জগদ্বন্ধু বলেছেন– "মানুষের মধ্যে কোনো উঁচু-নিচু ভেদাভেদ নেই। সবাই সমান। সবাই আমরা ঈশ্বরের সন্তান।"

তাই মানুষকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয়। জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরকেও সেবা করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ঈশ্বর জ্ঞানে জীব সেবার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন– "জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে–

"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন
ইহা হতে ধর্ম আর নাহি সনাতন।"

ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো। তোমার এ ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …

জীবের প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কিত আমরা একটি গল্প পড়ব।

জীবের প্রতি দীপ্তর ভালোবাসা

দীপ্ত একদিন মা-বাবার সাথে বাড়ি ফিরছিল। পথে একটি আহত দোয়েল পাখিকে দেখতে পেল। পাখিটি পথের পাশে পড়ে পাখা ঝাপটাচ্ছে। দীপ্তর খুব মায়া হলো। সে মা-বাবাকে অপেক্ষা করতে বলে পাখিটির কাছে গেল। দেখল, পাখিটির ডানা ভেঙে গেছে। দীপ্ত পাখিটিকে সাথে করে বাড়ি নিয়ে এল। কয়েক দিন নিজের কাছে রেখে পাখিটিকে যত্ন করে সুস্থ করে তুলল। তারপরে বাগানে ছেড়ে দিল। দীপ্তর এরূপ জীবসেবায় মা-বাবা খুব খুশি হলেন।

আমরাও জীবকে সেবা করব, জীবকে ভালোবাসব।

জীবের মঙ্গলের জন্য তুমি যে সকল কাজ করো লেখ:

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

পাঠের আলোকে জীবসেবা সম্পর্কিত বাণী পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করো।

অনুশীলনী

ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. আমরা বিভিন্নভাবে ---------- সেবা করতে পারি।

২. মানুষের মধ্যে কোনো উঁচু-নিচু --------- নেই।

৩. জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ---------- ।

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. সেবা অর্থ	ঈশ্বরের সন্তান।
২. জীবে দয়া নামে রুচি	ধর্মের অঙ্গ।
৩. সবাই আমরা	যত্ন পরিচর্যা।
৪. জীবসেবা	বৈষ্ণব সেবন।
	আশ্রয়হীনকে সহযোগিতা।

গ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. হিন্দুধর্মে সেবা শব্দটি অত্যন্ত –

ক) আবশ্যক　　খ) প্রয়োজনীয়

গ) অগ্রগণ্য　　ঘ) গুরুত্বপূর্ণ

২. মানুষ হিসেবে একে অপরকে ভালোবাসা –

ক) অবশ্য কর্তব্য　　খ) উচিত

গ) নিত্যকর্ম　　ঘ) দায়িত্ব

৩. জীবকে সেবা করলে কাকে সেবা করা হয়?

ক) শিক্ষককে খ) মাতা-পিতাকে

গ) ঈশ্বরকে ঘ) প্রতিবেশীকে

৪. জীবের মঙ্গলের জন্য যে সেবা তাই –

ক. ঈশ্বরসেবা খ. প্রাণিসেবা

গ. জীবসেবা ঘ. প্রকৃতিসেবা

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. জীবসেবা কাকে বলে?

২. জীবকে ভালোবাসলে কাকে ভালোবাসা হয়?

৩. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের কী করা উচিত?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. জীবের মঙ্গলের জন্য তুমি করো এমন পাঁচটি কাজের নাম লেখ।

২. "জীবসেবা ধর্মের অঙ্গ"– পাঁচটি বাক্যে ব্যাখ্যা করো।

৩. 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত কবিতাংশটি লেখ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেশপ্রেম

দেশের প্রতি রয়েছে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। দেশের প্রতি এই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা হলো দেশপ্রেম। দেশপ্রেম একটি নৈতিক গুণ। ধর্মের অঙ্গ।

নিজের দেশকে যিনি ভালোবাসেন, তিনি দেশপ্রেমী। মা সন্তানকে আদর-স্নেহের ছায়ায় আজীবন লালন-পালন করেন। তিনি সন্তানের সব ধরনের প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট থাকেন। তেমনি দেশও আমাদের কাছে মায়ের মতো। দেশের মাটি, জল, আলো, বাতাস, খাদ্যসহ প্রয়োজনীয় সবকিছুর সাহায্যে আমরা বেঁচে থাকি। এর মধ্য দিয়ে দেশের প্রতি জন্ম নেয় গভীর মমত্ববোধ।

মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ড বা আচরণের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম প্রকাশ পায়। বৃষ্টিতে কোথাও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হলে মানুষের চলাচলের অসুবিধা হয়। অনেকেই হয়তো বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করেন; কিন্তু যিনি দেশপ্রেমী তিনি পরিকল্পিতভাবে জলাবদ্ধতা নিরসনের উপায় বের করেন। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, বজ্রপাত, ভূমিকম্পসহ যেকোনো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশ ও দেশের মানুষ। তখন দেশপ্রেমী সামর্থ্য অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। দেশ ও দশের জন্য কাজ করতে অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করেন ।

কর্মেই ধর্মের পরিচয়। দেশের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগে দেশপ্রেম প্রকাশ পায়। দেশ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রকৃত দেশপ্রেমী নিজের জীবনের মায়া না করে দেশের জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, অংশগ্রহণ করেছেন, জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন দেশপ্রেমী। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন সবাই ছিলেন দেশপ্রেমী।

একজন দেশপ্রেমী দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকেন। দেশের জাতীয় দিবসসমূহে ভালোবাসা প্রকাশ করেন। ভালো কাজের মাধ্যমে নিজের দেশকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন।

যুগে যুগে পৃথিবীতে অসংখ্য দেশপ্রেমী জন্মগ্রহণ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, রাণী রাসমণি, ক্ষুদিরাম বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ দেশপ্রেমের জন্য অমর হয়ে আছেন।

আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের গভীর দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে। রামায়ণে বলা হয়েছে—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' অর্থাৎ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এই উক্তির মধ্য দিয়ে জননী এবং জন্মভূমির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার চিরন্তন অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রাচীনকালেও অনেকে দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত রেখে অমর হয়ে আছেন। আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে দেশপ্রেমের অনেক উপাখ্যান রয়েছে। এখন আমরা রামায়ণে বর্ণিত একজন দেশপ্রেমী রাজার কাহিনি জানব।

কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেম

প্রাচীনকালে চন্দ্রবংশীয় পরাক্রমশালী এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম কার্তবীর্যার্জুন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও ধার্মিক। রাজকার্য পরিচালনা করতে করতে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ক্লান্তি দূর করা দরকার। তাই তিনি রাজধানী থেকে একটি নির্জন স্থানে গেলেন। জায়গাটা খুব সুন্দর। চারপাশে বন। বনের মাঝে সুন্দর একটি রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের তিন দিকে বড়ো সরোবর। সরোবরগুলোতে অনেক পদ্ম ফুল ফুটে আছে। পরিবেশ অত্যন্ত চমৎকার। ঝিরঝির করে ঠান্ডা বাতাস বয়ে যায়। এখানে এলে এমনিতেই ক্লান্তি দূর হয়। রাজা কার্তবীর্যার্জুন সেখানে কিছুদিন থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সে সময়ে লঙ্কার রাজা ছিলেন রাবণ। তিনি ছিলেন খুব অত্যাচারী। সুযোগ পেলেই তিনি অন্যের রাজ্য আক্রমণ করতেন। যুদ্ধ করে সেই রাজ্য দখল করে নিতেন। তিনি জানতে পারলেন, রাজা কার্তবীর্যার্জুন রাজধানীতে নেই। এ সুযোগে রাবণ এসে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলেন। কার্তবীর্যার্জুনের এক সেনানায়কের সাথে দেখা হলে রাবণ তাকে বললেন– আমি কার্তবীর্যার্জুনের রাজ্য অধিকার করে নেব। ঐ সেনানায়ক এ কথা শুনে খুব রেগে গেলেন। তিনি বললেন, মহারাজ কার্তবীর্যার্জুন অবকাশ যাপন করছেন। আপনি এ সময়টাই বেছে নিলেন? মহারাজের হাতে পড়লে আপনার দশ মুণ্ডু চূর্ণ হয়ে যাবে। সেনানায়কের কথা শুনে রাবণ তার সাথেই যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলেন। সংবাদ পৌঁছানো হলো মহারাজ কার্তবীর্যার্জুনের কাছে। রাজ্য আক্রমণের সংবাদ শুনে কার্তবীর্যার্জুন ক্রোধে আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন। তিনি একমুহূর্তও দেরি করলেন না। রাজধানীতে ফিরে এলেন। সোজা চলে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হলো। এক পক্ষ আক্রমণকারী ও দখলদার। আরেক পক্ষ আক্রান্ত ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। কার্তবীর্যার্জুন সৈন্যদের উচ্চ কণ্ঠে বললেন সৈন্যগণ, পরাজিত হলে দেশ হবে পরাধীন।

প্রাণপণ যুদ্ধ করো। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করো। মহারাজের কথায় সৈন্যদের উৎসাহ বেড়ে গেল। তারা প্রাণপণ যুদ্ধ করল। রাবণ হলেন পরাজিত। জয় হলো কার্তবীর্যার্জুনের। আনন্দে-আবেগে ভরে উঠল দেশপ্রেমী রাজা কার্তবীর্যার্জুনের হৃদয়।

আমরাও কার্তবীর্যার্জুনের মতো দেশপ্রেমী হব। সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তির মতো আমাদের দেশকে ভালোবাসব। দেশের মঙ্গলের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য কাজ করব। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকব। নিজেকে দেশপ্রেমী নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করব।

দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের কয়েকটি উপায় সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে লেখ:

তোমার বিদ্যালয়ে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং মহান বিজয় দিবস পালনের জন্য কী কী কর্মসূচি গ্রহণ করতে চাও নিচের ছকে লেখ:

দিবসের নাম	তারিখ	কর্মসূচি
মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস		
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস		
মহান বিজয় দিবস		

অনুশীলনী

ক) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. নিজের দেশকে যিনি ভালোবাসেন, তিনি ----------।
২. কর্মেই ---------- পরিচয়।
৩. জননী জন্মভূমিশ্চ ---------- গরীয়সী।
৪. দেশ আমাদের কাছে ---------- মতো।

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. কার্তবীর্যার্জুন ছিলেন অত্যন্ত	শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।
২. লঙ্কার রাজা	নৈতিক গুণ।
৩. দেশের প্রতি রয়েছে সকলের	সৎ ও ধার্মিক।
৪. দেশপ্রেম একটি	ছিলেন রাবণ।
	মমত্ববোধ।

গ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. দেশের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগে প্রকাশ পায় –

ক) দেশপ্রেম　　খ) জীবপ্রেম
খ) প্রকৃতিপ্রেম　　ঘ) মানবপ্রেম

২. নিজের দেশকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে আমাদের কী করতে হবে?

ক) ভালো কাজ　　খ) বক্তৃতা প্রদান
গ) রাস্তা মেরামত　　ঘ) গাছ লাগানো

৩. লঙ্কার রাজা রাবণ ছিলেন অত্যন্ত –

ক) সৎ　　খ) কঠোর
গ) নীতিবান　　ঘ) অত্যাচারী

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. কয়েকজন দেশপ্রেমীর নাম লেখ।
২. দেশপ্রেম কীসের মাধ্যমে প্রকাশ পায়?
৩. দেশ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রকৃত দেশপ্রেমী কী করেন?
৪. পবিত্র ধর্মগ্রন্থ রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের কী প্রকাশ পেয়েছে?
৫. রাজ্য আক্রান্ত হলে কার্তবীর্যার্জুন তাঁর সৈন্যদের কী বলেছিলেন?

ঙ) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর দাও:

১. দেশ আমাদের কাছে কেন মায়ের মতো?
২. কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেমের কাহিনি তোমাকে কীভাবে উজ্জীবিত করে?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য, চতুর্থ শ্রেণি–হিন্দুধর্ম শিক্ষা

যদি শান্তি চাও, কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের।
–সারদা দেবী

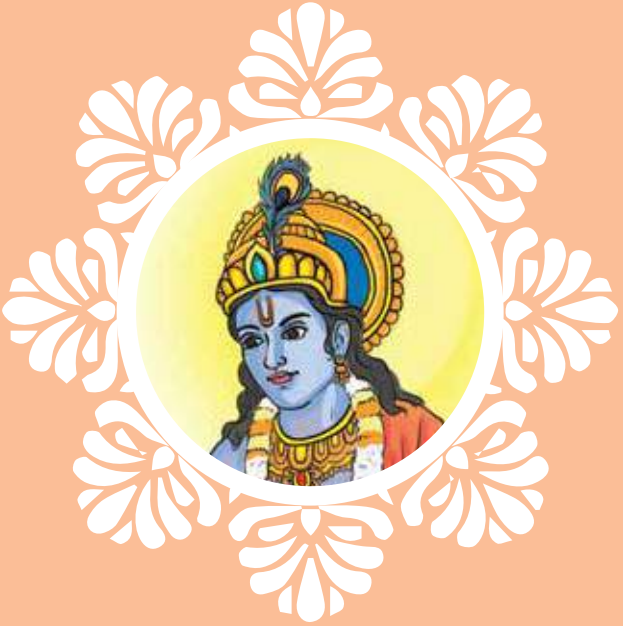

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য